১. আজিব রাজীব

ছোটাচ্চুর ঘরে মিটিং, সব বাচ্চারাই এসেছে। ছোটাচ্চু একটা চেয়ারে বসেছে, বাচ্চাদের কেউ বিছানায় কেউ মেঝেতে। এক দুইজন দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ছোটাচ্চু তার গালের বিন্দি বিন্দি দাড়ি দুই একবার ঘষে বলল, "তোদেরকে আমি কেন ডেকেছি আমি নিজেই জানি না, কারণ আমি যেটা তোদেরকে বলব সেটা মোটেও বাচ্চাদের সাথে আলোচনা করার বিষয় না।"

একজন রিনরিনে গলায় বলল, "বুঝেছি! বুঝেছি তুমি কী নিয়ে কথা বলবে!"

ছোটাচ্চু একটু অবাক হয়ে বলল, "কী নিয়ে?"

"ইয়ে এবং বিবাহ!"

সবাই মাথা নেড়ে আনন্দে চিৎকার করল, বলল, "ইয়েস! ইয়েস! ইয়ে এবং বিবাহ!"

ছোটাচ্চু কেমন যেন একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর গাল ঘষে বলল, "তোদের সব কিছু নিয়ে ইয়ারকি!"

একজন বলল, "এটা মোটেও ইয়ারকি না।"

ছোটাচ্চু বলল, "যেটা বুঝিস না সেটা নিয়ে কথা বলিস না!"

আরেকজন বলল, "কে বলেছে আমরা বুঝি না? মনে নাই তোমাদের দুইজনের যখন প্যাঁচ লেগে গিয়েছিল তখন আমরা–

ছোটাচ্চু একটা ধমক দিল, বলল, "চুপ কর!"

**

বাচ্চারা চুপ করল কিন্তু মুখ টিপে খিকখিক করে হাসতে লাগল। ছোটাচ্চু বলল, "আমি তোদেরকে ডেকেছি আমি এখন কী করব সেটা বলতে।"

বাচ্চারা চিৎকার করল, "বল! বল ছোটাচ্চু, বল!"

ছোটাচ্চু বলল, "তোরা সবাই জানিস আমি এই দেশের প্রথম একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছিলাম। একদিন যখন এই দেশে ডিকেটটিভ এজেন্সির ইতিহাস লেখা হবে আমার নাম সেখানে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।"

টুম্পা বলল, "এবং টুনি আপুর।"

শান্ত বলল, "আমার নামটাও লিখতে হবে। আমি আর আমার বন্ধুরা মিলে গাবড়া বাবারে ধরেছিলাম মনে আছে? যা একটা ল্যাং মেরেছিলাম–"

প্রমি বলল, "মারামারি করার জন্য কারো নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে না।"

টুম্পা বলল, "শান্ত ভাইয়া, তোমার নামটা লেখা হবে পিতলের

অক্ষরে।

মুনিয়া বলল, "না হলে প্লাস্টিকের অক্ষরে।" তখন সবাই হি হি করে

হাসতে শুরু করল।

টুনি বলল, "তোমরা সবাই একটু চুপ করবে? ছোটাচ্চু কী বলতে চায় একটু শুনি।"

প্রমি বলল, "হ্যাঁ, সেটা শুনি। সবাই চুপ।

সবাই শেষ পর্যন্ত চুপ করল তখন ছোটাচ্চু তার গলা পরিষ্কার করে আবার শুরু করল। বলল, "তোরা জানিস আমি রেকর্ড সময়ের ভিতরে দা আল্টিমেট ডিটেকটিভ এজেসন্সি দাঁড়া করিয়েছিলাম। ক্রাইম সলভ করার জন্য একটা টিম তৈরি করেছিলাম। সেই টিমটি ছিল আধুনিক, প্রশিক্ষিত, দক্ষ, সাহসী এবং অ্যাঁ অ্যা–"

ছোটাচ্চু বলার মতো আরেকটা শব্দের জন্য মাথা চুলকাতে লাগল। শান্ত তখন সাহায্য করার চেষ্টা করল, বলল, "রাজপথের লড়াকু সৈনিক।"

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, "রাজপথের লড়াকু সৈনিক?"

"হ্যাঁ।"

"এখানে রাজপথের লড়াকু সৈনিকের কী আছে?"

"জানি না। কিন্তু দেখেছি সবসময় বলে।"

ছোটাচ্চু মুখ শক্ত করে বলল, "পলিটিক্স করার সময় এগুলো বলে গাধা কোথাকার। আমি কি পলিটিক্স করতে গেছি?"

একজন বলল, "উল্টোটা হয়েছে। সরফরাজ কাফি পলিটিক্স করে ছোটাচ্চুকে বের করে দিয়েছে। তাই না ছোটাচ্চু?"

ছোটাচ্চু কোনো উত্তর না দিয়ে তার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল।

টুনি বলল, “তোমরা ছোটাচ্চুকে কথাই বলতে দিচ্ছ না। তোমরা কি কয়েক মিনিটের জন্য কথা বন্ধ করবে?”

সবাই আবার কথা বন্ধ করল, তখন ছোটাচ্চু বলল, “আমি জাতির সামনে প্রমাণ করেছি যে আমি জিরো থেকে শুরু করে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি। আমি শুধু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন রহস্যভেদী ডিটেকটিভ নই–আমি একই সাথে একজন অসাধারণ সংগঠক!”

কেউ একজন হাসি চাপতে গিয়ে নাক দিয়ে শব্দ করে ফেলল এবং সেটা শুনে আরো কয়েকজন খুকখুক করে হেসে ফেলল। ছোটাচ্চু সেটা না শোনার ভান করে বলল, “আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে আমি চাইলেই পারি। আমি অসাধ্য সাধন করতে পারি। আমি কর্মঠ, উৎসাহী, উদ্ভাবক–”

শান্ত ছোটাচ্চুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, “ছোটাচ্চু নিজের প্রশংসা নিজের করা ঠিক না।”

ছোটাচ্চু থতমত খেয়ে বলল, “কী বললি?”

“বলেছি যে নিজের প্রশংসা নিজে করা ঠিক না। আমি যখন করি তখন সবাই মিলে আমাকে গালাগাল করে প্রমি বলল, “মোটেই না শান্ত। তোকে কেউ গালাগাল করে না। তোকে নিয়ে হাসাহাসি করে। হাসাহাসি আর গালাগালি করা এক জিনিস না।”

শান্ত গম্ভীর গলায় বলল, “হাসাহাসি করা গালাগালি করা থেকে অনেক বেশি খারাপ করা– “

“মোটেও না। হাসাহাসি হচ্ছে আনন্দ করা, গালাগালি হচ্ছে ঝগড়া টুনি একটু অধৈর্য হয়ে বলল, “তোমাদের জন্য আমরা ছোটাচ্চুর

আসল কথাটাই শুনতে পাচ্ছি না। ছোটাচ্চু আমাদেরকে ডেকেছে একটা কথা বলার জন্য, সেটা আগে শুনি।"

তখন আবার সবাই চুপ করল। ছোটাচ্চু কটমট করে সবার দিকে তাকাল তারপর বলল, "কথা বলার সময় তার মাঝে একটা ফ্লো থাকে। সেই ফ্লো থাকলে কথা বলা যায়। তোরা বার বার সেই ফ্লো নষ্ট করে দিচ্ছিস কেউ একজন বলল, "আর করব না।"

"মনে থাকে যেন।"

"মনে থাকবে।"

ছোটাচ্চু আবার শুরু করল, কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, "কী যেন বলছিলাম?"

একজন বলল, "তুমি কতো পরিশ্রমী আর উৎসাহী–'

আরেকজন যোগ করল, "আর বুদ্ধিমান–"

আরেকজন যোগ করল, "আর উৎপাদক — "

আরেকজন ধমক দিল, "উৎপাদক না গাধা, উদ্ভাবক –"

"আমি স্পষ্ট শুনেছি ছোটাচ্চু বলেছে উৎপাদক।"

"মোটেই না। ছোটাচ্চু বলেছে উদ্ভাবক। তাই না ছোটাচ্চু?"

টুনি আবার বাধা দিল, "প্লিজ তোমরা চুপ করো। ছোটাচ্চুকে বলতে দাও।"

সবাই চুপ করল, ছোটাচ্চু সবার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, "আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে মানুষের জীবন হচ্ছে বহমান নদীর মতো। চলতে চলতে সেটি গতি পাল্টায়। আইনস্টাইন এতো বড় বৈজ্ঞানিক তিনি পর্যন্ত শেষ জীবনে বেহালা বাজিয়ে কাটিয়েছেন।"

শাহানা আপত্তি করতে গিয়ে থেমে গেল। ছোটাচ্চু বলতে লাগল, "নিউটন কী করলেন? পলিটিক্স? এমন কী আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত জমিদারি শুরু করেছিলেন।"

এবারে শাহানা একটু আপত্তি না করে পারল না, বলল, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারি শুরু করেছিলেন সেটা মনে হয় ঠিক না। আগে থেকে ফেমিলির জমিদারি ছিল–"

ছোটাচ্চু থামিয়ে দিল, "একই কথা। আমি যেটা বলি সেটা শোন।" ছোটাচ্চু তার মুখে একটা দার্শনিকের মতো ভাব ফুটিয়ে বলল, "আমি বলতে চাচ্ছি যে সবার জীবনই এরকম, একটা কিছু করতে করতে অন্য কিছু করা। যার ভেতরে যত বেশি মালপানি সে তত বেশি ধরনের কাজ করতে পারে।"

একজন বলেই ফেলল, "কখনো বেহালা, কখনো পলিটিক্স কখনো জমিদারি–"

ছোটাচ্চু চোখ পাকিয়ে তাকাল কিন্তু কোনো জবাব দিল না। আগের সুরে বলতে লাগল, কাজেই আমিও মনে মনে ভাবছি একই জীবনে শুধু একটা কাজ করে কেন খুশি থাকব? কেন নানা ধরনের কাজ করব না?"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "নানা ধরনের কী কাজ ছোটাচ্চু?"

শান্ত বলল, “বলেছেনই তো, বেহালা বাজাতে বাজাতে পলিটিক্স আর অফ টাইমে জমিদারি।”

প্রমি বলল, “চুপ কর গাধা। জমিদারি কবে উঠে গেছে।”

টুনি আবার জিজ্ঞেস কলল, “নানা ধরনের কী কাজ?”

ছোটাচ্চু বলল, “এইতো।”

“এইতো মানে কী?”

“এইতো মানে–” ঠিক তখন ছোটাচ্চুর টেলিফোনটা বেজে উঠল। ছোটাচ্চু নম্বরটা দেখে ভুরু কুঁচকালো। তারপর কানে লাগিয়ে বলল, “হ্যালো।”

অন্য পাশ থেকে একজন মহিলার গলার স্বর শোনা গেল, বলল, “এইটা কি ডিটেকটিভ শাহরিয়ার সাহেবের নাম্বার?”

“জী, কথা বলছি।”

“ও আচ্ছা। হাউ নাইস! আমার কী সৌভাগ্য আমি এতো বড় একজন ডিটেকটিভের সাথে সরাসরি কথা বলছি।

বাচ্চারা টেলিফোনের কথা শুনতে পাচ্ছিল না কিন্তু দেখল ছোটাচ্চুর মুখে বিশাল একটা হাসি ফুটে উঠেছে। তারা অপেক্ষা করতে থাকে কখন টেলিফোনের আলাপ শেষ হয় কিন্তু সেটা শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, হাত দিয়ে মুখের নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে ছোটাচ্চুকে টেলিফোনটা তাড়াতাড়ি শেষ করে দেওয়ার জন্য ইঙ্গিত দিতে লাগল কিন্তু কোনো লাভ হলো না। ছোটাচ্চু মুখের

মাঝে একটা মোলায়েম হাসি ফুটিয়ে কথা শুনেই যেতে লাগল, মাঝে মাঝে শুধু বলতে লাগল, "ও আচ্ছা!"

"তাই নাকি?"

"বাহ্!"

"কী চমৎকার"

"সত্যি?"

"অসাধারণ।"

"ভেরি গুড।"

"নো প্রবলেম!"

"অবশ্যই অবশ্যই।"

"কী যে বলেন!"

ছোটাচ্চু ঠিক নতুন কী কাজ করবে সেটা জানার জন্য সবাই অনেক আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল কিন্তু ছোটাচ্চুর টেলিফোন আলাপ শেষ হওয়ার কোনো লক্ষণ না দেখে শেষ পর্যন্ত একজন একজন করে উঠে যেতে লাগল। তারা গিয়ে দাদি (কিংবা নানির) ঘরে একত্র হলো এবং ছোটাচ্চু কী ধরনের কাজ করতে পারে সেটা নিয়ে নিজেরাই জল্পনা কল্পনা করতে লাগল। তাদের

আলোচনাগুলো হলো এরকম :

“আমার মনে হয় ছোটাচ্চু কুমিরের ব্যবসা করবে।”

“কুমির? কুমিরের ব্যবসা কীভাবে করে?”

“ও মা! সেটাও জানিস না। অনেক বড় পুকুর কেটে সেখানে কুমির এনে ছেড়ে দেয়। যেভাবে গরুর ফার্ম হয়, মুরগির ফার্ম হয়, সেরকম কুমিরের ফার্ম হয়। কুমির অনেক দামে বিক্রি হয়।”

“আমার মনে হয় না ছোটাচ্চু কুমিরের ফার্ম করবে।”

“কেন?”

“কুমিরের ফার্ম করতে অনেক টাকা লাগে। অনেক বড় জায়গা কিনতে হয়। বিদেশ থেকে কুমির আনতে হয়। ছোটাচ্চুর এতো টাকা নাই।”

“ঠিকই বলেছিস। ছোটাচ্চু এমন বিজনেস করবে যেখানে টাকা লাগে না।”

“সেটা কিসের বিজনেস?”

“আমার মনে হয় ছোটাচ্চু তেলাপোকার বিজনেস করবে!”

“তেলাপোকা? ছিঃ! ইয়াক থুঃ!”

“ছিঃ ইয়াক থু করছিস কেন? জানিস না চাইনিজরা তেলাপোকা খায়?”

“সত্যি? ইয়াক থু!”

“সত্যি। শুধু তেলাপোকা না–সব রকম পোকা, পোকার ডিম সব কিছু খায়।”

“কীভাবে খায়? তেলাপোকা পালিয়ে যায় না?”

“ধুর বোকা। জ্যান্ত খায় নাকি? ভেজে খায়!”

আচ্ছা! আমি ভেবেছিলাম জ্যান্ত খায়। প্লেটের উপরে জ্যান্ত

তেলাপোকা রাখে, তারপর সেগুলো ধরে ধরে খায়।”

“না, না। জ্যন্ত তেলাপোকা খায় না। ভেজে মুচমুচে করে খায়। চানাচুরের মতন। খুব টেস্টি!”

“খুব টেস্টি? তুই কী খেয়ে দেখেছিস নাকি?”

“না, আমি খাই নাই, গুগলে দেখেছি।”

“তাহলে ছোটাচ্চু তেলাপোকার ব্যবসা করবে? এই ব্যবসায় টাকা-পয়সা লাগে না। সব বাসাতেই ফ্রি তেলাপোকা পাওয়া যায়।”

“কিন্তু একটা সমস্যা আছে।

“কী সমস্যা?’

“ছোটাচ্চু মনে হয় তেলাপোকাকে ভয় পায়।”

“উঁহু, ছোটাচ্চু মাকড়সাকে ভয় পায়।”

“শুধু মাকড়সাকে না। তেলাপোকাকেও ভয় পায়। মনে নাই সেইদিন একটা তেলাপোকা উড়তে শুরু করেছিল তখন ছোটাচ্চু কী ভয় পেয়েছিল?”

“হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিকই বলেছিস।”

“আমার কী মনে হয় জানিস?”

“কী?”

“সবচেয়ে সহজে টাকা বানানোর উপায় হচ্ছে কোচিং সেন্টার দেওয়া “কোচিং সেন্টার?”

“হ্যাঁ।”

“কিন্তু কোচিং সেন্টার দিতে হলে ছাত্রদের পড়াতে হয় না?”

“ধুর! পড়াতে হয় না। খালি মডেল টেস্ট নিতে হয়।”

“মডেল টেস্ট?”

“হ্যাঁ। একটার পর একটা। যত মডেল টেস্ট তত টাকা।”

“ঠিকই বলেছিস। বলতে হয় জিপিএ ফাইভ গ্যারান্টি। বিফলে মূল্য ফেরত।”

“তাহলে লাভ কী?”

“কেউ কেউ তো নিজ থেকে জিপিএ ফাইভ পেয়ে যাবে, সেটাই লাভ।”

“হুম! তাহলে ছোটাচ্চু কোচিং সেন্টার দিবে?”

“মনে হয়।”

“আমার অন্য একটা জিনিস মনে হচ্ছে।”

“কী মনে হচ্ছে?”

“ছোটাচ্চু কোচিং সেন্টারই দিবে কিন্তু অন্য রকম কোচিং সেন্টার।

“অন্য কী রকম কোচিং সেন্টার?”

“ডিটেকটিভ কোচিং সেন্টার।”

“ডিটেকটিভ?”

“হ্যাঁ বড় করে বিজ্ঞাপন দিবে। লেখা থাকবে, বিখ্যাত ডিটেকটিভ শাহরিয়ারের কাছ থেকে হাতে-কলমে ডিটেকটিভের কাজ শিখুন।

“মানুষেরা আসবে?”

‘একশো বার আসবে। পাশে ছোটাচ্চুর একটা ছবি থাকবে চোখে কালো গগলস, মাথায় হ্যাট আর হাতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস।”

“আর অন্য হাতে পিস্তল-”

“হ্যাঁ, পিস্তল। একেবারে ফাটাফাটি বিজ্ঞাপন, ছোটাচ্চু ছাত্রদের জায়গা দিতে পারবে না।”

দাদির ঘরে বাচ্চারা যখন এরকম আলোচনা করছে তখন ছোটাচ্চুকে একজন মহিলা তার ছেলের কথা বলছিলেন। সব মা-

বাবাই মনে করে তার ছেলে বা মেয়ে ছোটখাট আইনস্টাইন না হয় মাদাম কুরী। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা আসলেই অন্যরকম। এই মহিলার ছেলেটা আসলেই বিস্ময়কর। ছোটাচ্চুর সাথে ভদ্র মহিলার কথাবার্তা এভাবে শুরু হয়েছিল — মহিলা বলছিলেন, "আমি আপনার কাছে একটা বিশেষ কারণে ফোন করেছি। আপনাকে আমার ছেলের কথা বলতে চাই। তার একটা কারণও আছে, যদি কিছুক্ষণ সময় দেন তাহলে বলি।"

"কোনো সমস্যা নেই, বলেন।

"আমার ছেলের নাম রাজীব, তার বয়স আট। কিন্তু সে মোটেও আট বছরের একটা বাচ্চার মতো না। জানি না আপনি বিশ্বাস করবেন কি না সে হায়ার এলজেবরা আর ট্রিগোনোমেট্রি শেষ করেছে, এখন ক্যালকুলাস শিখছে।"

ছোটাচ্চু খাবি খেল, বলল, "অবিশ্বাস্য! কী বলছেন আপনি?"

"বিশ্বাস না করলে আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।"

"না, না অবিশ্বাস করছি না।"

"সে এর মাঝে চারটা ভাষা জানে। বাংলা, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ আর কোরিয়ান। বাংলা ইংরেজিটা আমরা তার সাথে নিজেরাই কথা বলতে পারি, অন্য দুটো করার জন্য এম্বেসি আর হাই কমিশন থেকে লোক খোঁজ করতে হয়।"

"কী অসাধারণ!"

"হ্যাঁ নিজের ছেলে বলে বলছি না, আসলেই অসাধারণ। সে এর মাঝে দুইটা কম্পিউটার ল্যাংগুয়েজে প্রোগ্রামিং করতে পারে, সি

প্লাস প্লাস আর পাইথন, আমি তার কিছু বুঝি না! সেদিন দেখেছি একটা প্রোগ্রাম লিখেছে সেটা দাবা খেলতে পারে!”

“দাবা? দাবা খেলার প্রোগ্রাম?” ছোটাচ্চু প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

“জী। দাবা। আমি খুব ভালো দাবা খেলতে পারি না, আমাকে খুব সহজে হারিয়ে দেয়। রাজীবের বাবাকে অবশ্য পারে না! শুধু দাবা খেলার প্রোগ্রাম না, আরো অনেকগুলো গেম বানিয়েছে

ছোটাচ্চু বলল, “কী আশ্চর্য! মাত্র আট বছরের একটা ছেলে?”

“জী। আট বছর তিন মাস। এর মাঝে দুনিয়ার সব বই পড়ে ফেলেছে। গল্প, উপন্যাস, বিজ্ঞান, ইতিহাস। এখন কলেজ লেভেলের ফিজিক্স বই পড়ছে। বুঝেছেন?”

“জী। দেশের মানুষের তো আপনার ছেলের কথা জানা উচিত মহিলা বললেন, “একজাক্টলি! আমি ঠিক এই জন্যে আপনাকে ফোন করেছি।”

“আমি আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?”

“একটা টেলিভিশন চ্যানেল আমার ছেলের ওপর একটা প্রোগ্রাম করতে চেয়েছিল। ঠিক যেদিন টেলিভিশনের ক্রু আসবে আমার ছেলের প্রচণ্ড জ্বর তার সাথে পেটে ব্যথা আর বমি। প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করতে হলো। আরেকবার আমরা ছেলেকে নিয়ে যাব টেলিভিশন স্টুডিওতে, রাস্তায় গাড়ি ভেঙে গেল। আরেকবার সাংবাদিক আসবে বাসায় রাজীবের দাঁতে ব্যথা! মুখ ফুলে একাকার : সাথে একশো তিন ডিগ্রি জ্বর। “

“কী আনফরচুনেট।” ছোটাচ্চু জিব দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করে বলল, “যাই হোক সবসময় তো আর এরকম ঘটবে না। তা ছাড়া সময়ও চলে যায় নাই।”

“আমি আসলে এ জন্যই আপনাকে ফোন করেছি। আমাদের কী সন্দেহ হয় জানেন?”

“কী?”

“এই ঘটনাগুলো ইচ্ছাকৃত। কেউ একজন ইচ্ছা করে এটা আমার ছেলের বিরুদ্ধে করছে।

“ইচ্ছা করে?”

”হ্যাঁ। ইচ্ছা করে করছে। শত্রুতা করে করছে। কেউ একজন চায় না আমার ছেলের কথা দেশের মানুষ জানুক। “

“কেন?” ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, “কেন চাইবে না?”

“হিংসা করে।”

ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, “আপনি কাউকে সন্দেহ করেন?”

মহিলা গলার স্বর নিচু করে বললেন, “জী। করি। সেই জন্য আপনাকে ফোন করেছি। আমি সামনাসামনি আপনাকে সেটা বলতে চাই।”

ছোটাচ্চু বলল, “আমার তো নিজের অফিস নাই, আপনাকে তাহলে আমার বাসায় আসতে হবে

“আসব। আমি চলে আসব। আপনি আমার ছেলেটাকে রক্ষা করেন, কেন জানি মনে হয় তার ওপর অনেক বিপদ। মনে হয় এরকম প্রতিভাবান না হয়ে সাধারণ ছেলে হলেই ভালো হতো। তাহলে তার ওপর কারো এত নজর থাকতো না।”

ছোটাচ্চু সাহস দিয়ে বলল, “আপনি ভয় পাবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।”

ছোটাচ্চু আরো কিছুক্ষণ রাজীবের মায়ের সাথে কথা বলে টেলিফোন রেখে দিল। বাচ্চাদের সাথে কথা বলার জন্য সে তাদের ডেকে এনেছিল, তারা শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে চলে গেছে। ছোটাচ্চু তাদের খুঁজে বের করার জন্য দাদির ঘরে গিয়ে দেখে তারা কোনো একটা বিচিত্র কারণে পা দিয়ে কান চুলকানোর চেষ্টা করছে। কেন পা দিয়ে কান চুলকাতে হবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন করা যায় কিন্তু ছোটাচ্চু সাহস করল না। বাচ্চারা তাকে দেখে কান চুলকানো বন্ধ করল, একজন বলল, “ছোটাচ্চু, তোমার কাজটা মোটেও ঠিক হয় নাই।”

অন্যরাও মাথা নাড়ল, বলল, “ঠিক হয় নাই। ঠিক হয় নাই।”

“আমাদেরকে ডেকে নিয়ে ফোনে কথা বলতে লাগলে।”

“কথা আর শেষ হয় না! বলতেই থাকলে বলতেই থাকলে। ছোটাচ্চু বলল, “জরুরি একটা ফোন চলে এসেছে, আমি কী করব?” একজন বলল, “আমরা অবশ্য চিন্তা ভাবনা করে বের করে ফেলেছি “কী বের করে ফেলেছিস?”

“তুমি এখন কী করবে?”

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, “কী করব?”

মুনিয়া রিনরিনে গলায় বলল, “তেলাপোকা ভাজা বিক্রি করবে!”

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। আরেকজন বলল, “না, না। তুমি কোচিং সেন্টার দিবে। কোচিং সেন্টার সবচেয়ে বেশি টাকা!”

ছোটাচ্চু মুখ কালো করে বলল, “তোদের এই ধারণা? আমি টাকার জন্য কোচিং সেন্টার দিব?”

আরেকজন বলল, “এটা অন্যরকম কোচিং সেন্টার। ডিটেকটিভ হওয়ার কোচিং সেন্টার!”

ছোটাচ্চু হতাশভাবে মাথা নাড়ল, বলল, “তোদের ব্রেন ড্যাম্প হয়ে গেছে, তোদের চিন্তার দৌড় কোচিং সেন্টার পর্যন্ত!”

“তাহলে তুমি কী করবে?”

ছোটাচ্চু উঠে দাঁড়াল, বলল, “দেখি তোরা চিন্তা করে বের করতে পারিস কিনা। যেটা করব সেটার প্রথম অক্ষর ‘উ’।”

“উ?”

“হ্যাঁ।”

“উ’তে উট!” মুনিয়া চিৎকার করে বলল, “বুঝেছি বুঝেছি তুমি উট কিনে এনে কোরবানির ঈদের সময় বিক্রি করবে!”

“তোদের বুদ্ধি ঐ পর্যন্তই। ‘উ’ ছাড়াও এটাকে “কা”ও বলা যায়। প্রথম শব্দটা শুরু হচ্ছে ‘কা’ দিয়ে, পরের শব্দ ‘উ’ দিয়ে।”

“কা আর উ কাউ? মানে গরু? তাহলে গরুর ব্যবসা?”

ছোটাচ্চু মাথা নাড়তে নাড়তে বের হয়ে গেল। অন্যরা কিছুক্ষণ চিন্তা করে আবার পা দিয়ে কান চুলকানোর খেলায় ফিরে গেল। শুধু টুনি ছোটাচ্চুর পিছে পিছে বের হয়ে এল। ছোটাচ্চুর ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে কে ফোন করেছিল ছোটাচ্চু?"

"একটা আট বছরের ছেলের মা।"

"কেন?"

"কেন আবার, একটা সমস্যা সমাধান করার জন্য।"

"কী সমস্যা?"

"ছেলেটা অসম্ভব ব্রাইট–এখনই তিন চারটা ল্যাঙ্গুয়েজ জানে, এলজেবরা, ট্রিগোনোমেট্রি, ক্যালকুলাস জানে, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করতে পারে, কলেজের ফিজিক্স পড়ে–"

টুনি জিব দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করে বলল, "আহা বেচারা!" ছোটাচ্চু চোখ কপালে তুলে বলল, "আহা বেচারা? আহা বেচারা হবে কেন?"

'একজন প্রডিজি–আহা বেচারা হবে না তো কী?"

"প্রডিজি?"

"হ্যাঁ।"

"সেটা আবার কী? কোনো অসুখ নাকি?"

টুনি বলল, "অসুখের মতোই বলতে পার। এতো ছোট থাকতে যদি এতো কিছু করতে পারে সেটা তো অসুখের মতোই!"

ছোটাচ্চু বলল, “কী বলছিস তুই? এতো জিনিয়াস একটা ছেলে আর তুই বলছিস অসুখের মতো?”

“আসলে আমি নিজে তো কখনো প্রডিজি দেখি নাই, শুধু তাদের কথা শুনেছি। আম্মু এই মোটা একটা সাইকোলজির বই এনেছিল সেখানে প্রডিজিদের কথা লেখা ছিল। ইংরেজি বই–ঠিক করে পড়তে পারি নাই। সেইখানে লেখা ছিল।

“কী লেখা ছিল?”

“প্রডিজি হওয়া যতটুকু ভালো তার থেকে বেশি যন্ত্রণা।”

“কেন যন্ত্রণা কেন?”

“জানি না।”

ছোটাচ্চু রেগে গিয়ে বলল, “তুই জানিস না আর বলে দিলি ছোটবেলা জিনিয়াস হওয়া খারাপ?”

“বললাম তো ছোটাচ্চু, বইটা ইংরেজিতে লেখা ছিল, বাংলায় হলে পড়ে ফেলতাম। যেটুকু পড়েছি মনে হয়েছে-

“কী মনে হয়েছে?”

টুনি মাথা চুলকে বলল, “মনে হয়েছে বাবা-মা বাচ্চাটাকে নানা রকম চাপের মাঝে রাখে তখন বাচ্চাটার জীবনে কোনো মজা থাকে না। অন্য বাচ্চাদের মতো আনন্দ করতে পারে না।”

ছোটাচ্চু কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, “এটা মনে হয় তুই ঠিকই বলেছিস! এই মহিলাও মনে হয় তার বাচ্চাকে নিয়ে টেলিভিশন প্রোগ্রামিং করতে চায়–”

টুনি জিজ্ঞেস করল, “করে না কেন?”

“প্রত্যেকবার যখন করতে যায় তখন বাচ্চাটার জ্বর উঠে যায়–না হয় বমি, পেট ব্যথা, শরীর খারাপ। দাঁত ব্যথা সেই জন্যই–”

টুনি জিজ্ঞেস করল, “সেই জন্য কী?”

“সেই জন্য বাচ্চাটার মা আমার কাছে আলাপ করার জন্য আসছে। সন্দেহ করছে কেউ বাচ্চাটার উপর শত্রুতা করছে–কিছু একটা খাইয়ে দিচ্ছে।”

টুনি চোখ বড় বড় করে বলল, “বাচ্চাটার মা আমাদের বাসায় আসবে?”

“হ্যাঁ।”

“সত্যি?” টুনির চোখ চকচক করতে থাকে।

“সত্যি।”

“তাহলে তুমি তাকে বল বাচ্চাটাকে নিয়ে আসতে। প্লিজ ছোটাচ্চু প্লিজ।”

ছোটাচ্চু একটু অবাক হয়ে বলল, “কেন?”

“আমি বাচ্চাটাকে দেখতে চাই। প্রডিজি কেমন হয় আমি কখনো দেখি নাই।”

ছোটাচ্চু বলল, “আমিও দেখি নাই। মনে হয় হাত-পাগুলো হবে কাঠি কাঠি আর মাথাটা হবে ইয়া বড় গোল একটা ফুটবলের মতো।” বলে ছোটাচ্চু

হা হা করে হাসতে লাগল।

টুনি একটু অবাক হয়ে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে রইল।

পরের দিন বিকাল বেলা রাজীব নামের আট বছরের প্রডিজি ছেলেটাকে নিয়ে তার মা ছোটাচ্চুর সাথে দেখা করতে এলেন। টুনি আগে থেকেই সময়টা জেনে রেখেছিল। সে নিজেই দরজা খুলে তাদেরকে বসার ঘরের ভেতরে নিয়ে এলো। ছেলেটার মা ঠিক যেরকম হওয়ার কথা সেরকম, একটু নাদুস নুদুস, ফর্সা এবং গোলগাল। ছেলেটার চোখে চশমা, মাথার চুল এলোমেলো,

মুখটা বড় মানুষের মতো গম্ভীর। সেটা একটা কালো টি-শার্ট আর নীল হাফপ্যান্ট পরে আছে। ছেলেটা বসল না, ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। দেওয়ালে টানানো ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

টুনি ভিতরে গিয়ে ছোটাচ্চুকে ডেকে আনল, ছোটাচ্চু ছেলেটাকে দেখেই বলল, "এই তাহলে আমাদের ইয়াং জিনিয়াস!"

ছেলেটা নিশ্চয়ই এই কথাটা অনেকবার শুনেছে তাই সেটা শুনে তার কোনো রকম প্রতিক্রিয়া হলো না, ছোটাচ্চুর দিকে কেমন করে জানি তাকিয়ে রইল।

সোফায় বসে থাকা গোলগাল নাদুসনুদুস মহিলা ছেলেটাকে বললেন, "রাজীব, তুমি শাহরিয়ার সাহেবকে সালাম দাও।"

ছেলেটা মেশিনের মতো হাত তুলে সালাম দেওয়ার ভঙ্গী করে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল। ছোটাচ্চু বলল, "আরে না, না। আমাকে সালাম দিতে হবে না। তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? বস।'

টুনি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, “ও তোমাদের সাথে বসে থেকে কী করবে? আমাদের সাথে খেলবে। চল, ভেতরে চল।”

মহিলা শুনে মনে হলো খুবই অবাক হলেন, বললেন, “ও খেলবে?” তার কথা শুনে মনে হলো খেলা জিনিসটা খুবই ভয়ংকর কিছু–খেললে কিছু একটা সর্বনাশ হয়ে যায়। মহিলা বললেন, “ও কখনো খেলে না।”

টুনি জিজ্ঞেস করল, “তাহলে কী করে?”

মহিলা বললেন, “রাজীব পড়াশোনা করে, অঙ্ক করে, প্রোগ্রামিং করে।” টুনি মাথা নেড়ে বলল, “সবসময় এসব করলে মাথা আউলে যাবে।

আস আমার সাথে, খেলবে –“

বলে টুনি কাউকে কিছু বলতে না দিয়ে রাজীবের হাতটা খপ করে ধরে টেনে তাকে নিয়ে গেল। মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে হা হা করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই টুনি ছেলেটাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ছোটাচ্চু মহিলাটাকে বলল, “আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমাদের টুনি খুবই রেসপন্সিবল মেয়ে। রাজীবকে সে দেখে শুনে রাখবে।”

মহিলা বললেন, “কিন্তু রাজীব খুবই অমিশুক। কারো সাথে মিশতে চায় না, বন্ধু-বান্ধব নেই, নিজে নিজে থাকে। সে তো বড় মানুষের মতো তাই

বাচ্চাদের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না।

“না পারলে পারবে না, আবার চলে আসবে এখানে। আপনি কী বলতে এসেছেন সেটা বলেন, আমি শুনি।”

মহিলা নার্ভাসভাবে একটু পরে পরে দরজার দিকে তাকাতে লাগলেন। তিনি আশা করছেন তার ছেলে এক্ষুণি টুনির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে আসবে। কিন্তু সে এলো না।

টুনি ছেলেটাকে টেনে ভিতরে নিয়ে তার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকতে বলল। তারপর ফিসফিস করে বলল, “তুমি যদি চলে যেতে চাও তাহলে চলে যেও, শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও।”

ছেলেটা এখনো হকচকিয়ে আছে। বলল, “কী প্রশ্ন?”

“তুমি জ্বর তোলো কেমন করে?”

অন্য যে কোনো বাচ্চা হলে জিজ্ঞেস করতো, “জ্বর? কিসের জ্বর?” রাজীবের সেটা করতে হলো না, মুচকি হেসে বলল, “তুমি বুঝে গিয়েছ আমি নিজে করি?”

“না বোঝার কী আছে? পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, দাঁত ব্যথা এগুলো তো সোজা। কিন্তু জ্বর তোলা কঠিন। কীভাবে কর?”

“করি না। একটু গরম পানি রাখি, থার্মোমিটারটা সেখানে একবার চুবিয়ে নেই, কাউকে না দেখিয়ে।”

টুনি নিঃশব্দে হাসল, বলল,

“জিনিয়াস!”

ছেলেটা বলল, “কাউকে বলে দেবে না তো?”

“মাথা খারাপ? বাচ্চাদের কত সমস্যা–বড়রা সেগুলো কোনোদিন বুঝবে না। কোনোদিন বলব না।

ছেলেটা বলল, “থ্যাংকু।”

টুনি বলল, “এর জন্য থ্যাংকু দিতে হবে না। তুমি কী চলে যাবে নাকি আমাদের সাথে খেলবে?”

“আমি চলে যাব না। কিন্তু আমি তো কোনো কিছু খেলতে পারি না। “

“ধুর বোকা! খেলতে না পারার কী আছে!”

ছেলেটা চমকে উঠল, জীবনে কখনো কেউ তাকে বোকা বলেনি। এই প্রথম!

টুনি হাঁটতে হাঁটতে বলল, “আস আমার সাথে।”

ছেলেটা পিছনে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে বলল, “তোমরা কী খেলবে?”

“আজকের খেলাটা জানি না। প্রত্যেক দিন নতুন খেলা আবিষ্কার হয়।” টুনি হাঁটতে হাঁটতে টুম্পাকে পেয়ে গেল, টুম্পা একটু অবাক হয়ে রাজীবের দিকে তাকিয়ে বলল, “এই ভাইয়াটা কে?”

“এর নাম রাজীব। তার আম্মু ছোটাচ্চুর সাথে কথা বলতে এসেছে। রাজীব তাই আমাদের সাথে খেলবে।”

টুম্পার মুখে হাসি ফুটে উঠল, যে কোনো খেলা খেলতে টুম্পা সব সময় রেডি। টুনি বলল, “আগে ঝুমু খালাকে একটু নাস্তা দিতে বলে আসি।

“চল টুনি আপু।”

তিনজন মিলে রান্নাঘরে গিয়ে দেখে ঝুমু খালা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে একটা চামুচ ঘুরাচ্ছে। টুনি জিজ্ঞেস করল, “ঝুমু খালা, তুমি গান গাইছ কেন?”

“কেতলিতে পানি গরম করছি সেইজন্য

টুনি একটু অবাক হয়ে বলল, “কেতলিতে পানি গরম করার সময় গান গাইতে হয়?”

“হ্যাঁ।”

“কেন?”

“কেতলিতে পানি গরম করানোর সময় যদি তুমি কেতলির দিকে চায়া থাকো তাহলে হে টের পায় তখন দেরি করে। অন্যদিকে চায়া থাকলে তাড়াতাড়ি করে, সেই জন্য অন্যদিকে চায়া থাইকা গান গাইতে হয়।”

টুনি আর টুম্পা ঝুমু খালার এই রকম অনেক যুক্তি অনেকবার শুনেছে তাই তারা বেশি অবাক হলো না কিন্তু রাজীব প্রথমবার শুনেছে তাই সে ফিক করে হেসে ফেলল। ঝুমু খালা তখন রাজীবের দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি কেডা?“

রাজীব কিছু বলার আগেই টুনি বলল, “এর নাম রাজীব। রাজীবের আম্মু ছোটাচ্চুর সাথে দেখা করতে এসেছেন।”

“টিকটকির কাম?”

টুম্পা বলল, “টিকটকি না ঝুমু খালা, ডিকেটকটিভ।

“একই কথা।” ঝুমু খালা আবার রাজীবের দিকে তাকিয়ে বলল, “এই বয়সে তোমার চোখে এতো বড় চশমা কেন? দিন-রাত টেলিভিশনে কার্টুন দেখ?”

রাজীব মাথা নেড়ে বলল, “না, আমি কার্টুন দেখি না।”

“তাহলে?”

টুনি বলল, “মনে হয় দিন-রাত বই পড়ে, না হলে কম্পিউটারে কাজ করে সেইজন্য। তাই না রাজীব?’

রাজীব একটুখানি মাথা নাড়ল, তখন ঝুমু খালা বলল, “তার মানে তোমার মাথার ভিতরেও টুনির মতো খালি মগজ আর মগজ?”

টুনি বলল, “ঝুমু খালা, রাজীবের মাথার মগজ আমার মগজ থেকেও অনেক বেশি তেজী

“কী কও তুমি?”

“সত্যি কথা বলি।”

“তাহলে হে কি আমার ঘাসের বিচির অঙ্কটা পারব?

“জিজ্ঞেস করে দেখ।”

ঝুমু খালার সন্দেহ তবু যায় না। তারপরেও শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল, “ঠিক আছে কও দেখি, একটা কলাগাছের নয়টা পাতা। প্রত্যেকটা পাতায় নয়টা কানী বক। প্রত্যেকটা বকের মুখে নয়টা করে খইলসা মাছ, প্রত্যেকটা মাছের মুখে নয়টা করে ঘাসের বিচি। সব মিলিয়ে কয়টা বিচি? দেখি তুমি পার কি না–”

ঝুমু খালা কথা শেষ করার আগেই রাজীব বলল, “ছয় হাজার পাঁচশ একষট্টিটা।”

ঝুমু ঝালা প্রথমে হা করে তাকিয়ে রইল, তারপর হেসে ফেলল বলল, “তুমি এই অঙ্কটা আগে শুনছ।”

রাজীব বলল, “না। শুনি নাই।”

“তাহলে এতো তাড়াতাড়ি কেমন করে কইলা?”

রাজীব ইতঃস্তত করে চুপ করে রইল, টুনি বলল, “আমি তোমাকে বলেছি না ঝুমু খালা রাজীবের মাথার মগজ তোমার আমার মগজ থেকে অনেক বেশি তেজী! রাজীব আরো কঠিন অঙ্ক করতে পারে।

টুম্পা বলল, “ঝুমু খালা, খাইলশা মাছের বদলে মাগুর মাছ দিয়ে দাও মুখে আরো বেশি করে ঘাসের বিচি দাও, সেইটাও মনে হয় পারবে।

ঝুমু খালা বলল, “তুমি একটা দুধের বাচ্চা আরো কঠিন অঙ্ক করতে পারবা?”

রাজীব মাথা নাড়ল। ঝুমু খালা বলল, “কতো কঠিন পারবা?”

রাজীব বলল, “যেমন মনে করেন আপনি যদি জিজ্ঞেস করেন, একটা ইউনিভার্সে নয়টা গ্যালাক্সি, প্রত্যেকটা গ্যালাক্সিতে নয়টা প্লেনেটারি সিস্টেম, প্রত্যেক প্লেনেটারি সিস্টেমে নয়টা গ্রহ, প্রত্যেকটা গ্রহে নয়টা মহাদেশ, প্রত্যেকটা মহাদেশে নয়টা দেশ, প্রত্যেকটা দেশে নয়টা বিভাগ, প্রত্যেক বিভাগে নয়টা জেলা, প্রত্যেকটা জেলায় নয়টা উপজেলা, প্রত্যেকটা উপজেলায় নয়টা

গ্রাম, প্রত্যেকটা গ্রামে নয়টা মাঠ, প্রত্যেকটা মাঠে নয়টা বাগান, প্রত্যেকটা বাগানে নয়টা কলাগাছ, প্রত্যেকটা কলাগাছে নয়টা পাতা, প্রত্যেকটা পাতায় নয়টা বক, প্রত্যেকটা বকের মুখে নয়টা মাছ, প্রত্যেকটা মাছের মুখে নয়টা ঘাসের বিচি তাহলে আমি চেষ্টা করলে মনে হয় সেইটাও বলতে পারব।“

ঝুমু খালা হাত দিয়ে ঠাস ঠাস করে তার কপালে মেরে বলল, “বলে কী এই ছেলে? এই রাজীব তো দেখি আজিব। আজিব রাজীব!”

টুনি হাসিমুখে বলল, “আমি বলেছি না এই ছেলের মগজ তোমার আমার মগজ থেকে অনেক বেশি তেজি, হাজার গুণ পাওয়ারফুল!”

ঝুমু খালা বলল, “তাহলে বল দেখি কয়টা ঘাসের বিচি হয়?”

রাজীব চোখ বন্ধ করে উপরের দিকে তাকালো, নাক মুখ কুঁচকে চিন্তা করতে লাগল, দেখে মনে হলো তার পেট ব্যথা করছে। তারপর চোখ খুলে বলল, “আঠারো কোটি তেপান্ন লক্ষ দুই হাজার আঠারো কোটি আটাশি লক্ষ একান্ন হাজার আটশ একচল্লিশটা ঘাসের বিচি।”

ঝুমু খালা আবার তার কপালে ঠাস ঠাস করে মারল, বলল, “তুমি একটা কাগজে লেইখা দিয়া যাও, আমি মুখস্ত করে ফেলব!”

রাজীব হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল, “আপনি এটা কেন মুখস্ত করবেন?”

“সবাইরে জিজ্ঞেস করব! দেখি আর কেউ পারে কিনা।”

“ঠিক আছে, আমি লিখে দেব।“

“অঙ্কটাও লেইখা দিও, সেইটাও মুখস্ত করে ফেলব।”

“ঠিক আছে।”

টুনি বলল, “বুঝেছ ঝুমু খালা, ও আমাদের গেস্ট, অনেক বিখ্যাত গেস্ট, সেজন্যে তোমার কাছে এসেছিলাম বলার জন্য, তুমি আজকে খুব ভালো করে নাস্তা দিও!”

“ঠিক আছে।” তারপর রাজীবের দিকে তাকিয়ে বলল, “আজিব রাজীব! তোমার কী খেতে ভালো লাগে বল। কী খেতে চাও?”

রাজীব বলল, “আমাকে বাসায় মিষ্টি খেতে দেয় না। আমার মিষ্টি খেতে অনেক ভালো লাগে!”

ঝুমু খালা বলল, “গুড! রসমালাই কামিং। সাথে সিংগাড়া আর কাবাব।“

টুম্পা স্লোগান দেওয়ার ভঙ্গী করে বলল, “আমার খালা তোমার খালা ঝুমু খালা ঝুমু খালা!”

রান্নাঘর থেকে বের হওয়ার সময় টুনি বলল, “তোমার কেতলির পানি মনে হয় ফুটে গেছে!”

ঝুমু খালা দাঁত বের করে হেসে বলল, “এইজন্য কেতলির দিকে নজর দিতে হয় না, তাহলে তাড়াতাড়ি ফুটে!”

রান্নাঘর থেকে বের হয়ে টুনি টুম্পাকে বলল, “টুম্পা তুই যা দেখি যাদেরকে পাস খুঁজে নিয়ে আয়, আমরা এখন রাজীবকে নিয়ে খেলব!”

“কী খেলব টুনি আপু?”

“কোনো মজার খেলা–রাজীব মনে হয় কোনো খেলাই জানে না!” রাজীব মাথা নেড়ে জানাল, কথাটা সত্যি। টুনি বলল, “তুই যা, আমি শাহানা আপুর সাথে একটু দেখা করে আসছি।”

“ঠিক আছে।“

টুনি রাজীবকে নিয়ে শাহানার রুমে গেল। শাহানা একটা পেন্সিল চিবাতে চিবাতে একটা খাতার উপর ঝুঁকে কিছু একটা দেখছে। টুনি জিজ্ঞেস করল, “কী করছ শাহানা আপু?”

“একটা ক্যালকুলাস প্রবলেম।” রাজীবের দিকে তাকিয়ে কলল, “এই বাচ্চা কে? আগে দেখিনি।“

“ঝুমু খালা নাম দিয়েছে আজিব রাজীব।”

“আজিব রাজীব? কেন? এই আজিব নাম কেন?”

টুনি বলল, “সেটা তুমি ঝুমু খালাকেই জিজ্ঞেস কর।”

রাজীব একটু এগিয়ে শাহানা আপুর খাতার দিকে ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা দেখে শাহানা আপুর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। শাহানা আপু জিজ্ঞেস করল, “কিছু বলবে?”

“না, না।”

টুনি বলল, “কিছু বলতে চাইলে বলে ফেল।

রাজীব ইতঃস্তত করে বলল, “আপনি ভেরিয়েবল ট্রান্সফর্মেশন করে চেষ্টা করেন, হয়ে যাবে। এক্স স্কয়ার প্লাস ফাইভ সমান জেড ধরতে পারেন।”

শাহানা আপুর চোয়াল ঝুলে পড়ল। বলল, “তোমার বয়স কত?”

“আট। আট বছর তিন মাস।”

“তোমার বয়স আট বছর আর তুমি ক্যালকুলাসের এই প্রবলেমটা এক নজর দেখেই বলে দিলে কীভাবে করতে হবে?”

রাজীব নিচু গলায় বলল, “আই এম সরি।

“সরি? সরি কেন?”

“না, এইতো সবার ব্যাপারে আমি নাক গলাই, কিছু একটা বলে ফেলি, এটা ঠিক না।”

শাহানা আপু অবাক হয়ে বলল, “কেন? ঠিক না কেন?”

“এর মাঝে নিজেকে দেখানোর একটা ভাব চলে আসে। এটা খুব খারাপ অভ্যাস। বিশেষ করে আমি যেহেতু ছোট–”

শাহানা আপু কী বলবে বুঝতে পারল না। একটু পরে বলল, “তুমি কী জান যে তুমি একটা প্রডিজি?”

রাজীব মাথা নাড়ল, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

“তুমি নিশ্চয়ই আরো অনেক কিছু করতে পার যেটা তোমার বয়সী বাচ্চারা পারে না।

রাজীব আবার মাথা নাড়ল, বলল, “আমি সেটা কাউকে জানতে দিতে চাই না। আমার আব্বু আম্মু ঠিক উল্টা, সবাইকে সব সময় বলে বেড়ায় টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করতে চায়, পত্রিকায় ইন্টারভিউ দিতে চায়। আমার অনেক যন্ত্রণা।’

শাহানা বলল, “কেন তুমি কাউকে জানতে দিতে চাও না? সবাই তো বিখ্যাত হতে চায়। তুমি তো বিখ্যাত হয়ে বসে আছ!”

“আমি কম্পিউটার প্রডিজির উপরে যত লেখা পাওয়া যায় সব পড়ে ফেলেছি। আমি দেখেছি ছোট থাকতে যারা প্রডিজি থাকে বড় হতে হতে তারা অন্যদের মতো সাধারণ হয়ে যায়। তাহলে ছোট থাকতে জিনিয়াস হয়ে লাভ কী?”

টুনি মাথা নেড়ে বলল, “এখন আমার মনে পড়েছে। আম্মু সাইকোলজির উপর যে বই এনেছিল সেখানেও এটা লেখা ছিল।”

রাজীব বলল, “আরো অনেক সমস্যা আছে।”

“কী সমস্যা?’

“ছোট থাকতে সব কিছু সহজ মনে হয়, শিখতে কোনো পরিশ্রম হয় না, তাই তারা কষ্ট করতে শিখে না। বড় হলে উল্টো ঝামেলায় পড়ে। অনেক সময় লেখাপড়াই হয় না। সেজন্য বাবা-মায়ের খুব কেয়ারফুল থাকতে হয়। আমার মা-বাবা এগুলো জানে না, বুঝে না, শুধু আমাকে সার্কাসের জন্তুর মতো দেখিয়ে বেড়াতে চায়, বাচ্চাদের সাথে মিশতেও দেয় না। “

টুনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আট বছরের বাচ্চা কিন্তু কতো সুন্দর করে বড় মানুষের মতো কথা বলছে! বাচ্চার গলার স্বর তা না হলে বোঝাই যেতো না যে একটা ছোট বাচ্চা কথা বলছে, মনে হতো বড় মানুষ কথা বলছে।

টুনি বলল, “আমি একটা কথা বলি?”

রাজীব বলল, “বল।”

“তোমার বয়স মাত্র আট হলেও তুমি আসলে একটা বড় মানুষের মতো। তোমার জন্য কোনটা ভালো কোনটা খারাপ তুমি খুব ভালো করে জান। তাই তুমি ঠিক ঠিক জিনিসগুলো করার চেষ্টা কর”

“আমি তো তাই করতে চাই কিন্তু আমার আব্বু আম্মু সেগুলো করতে দেয় না।”

“চেষ্টা করতে থাকো। তুমি পারবে।”

শাহানা আপু বলল, “আমাদের টুনির কিন্তু অনেক বুদ্ধি। সে কিন্তু তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।“

রাজীব মাথা নাড়ল, বলল, “আমি টের পেয়েছি!”

“কীভাবে টের পেলে?”

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, “বলা যাবে না। এইটা আমাদের দুইজনের সিক্রেট।”

ঠিক তখন হুড়মুড় করে অনেকগুলো বাচ্চা একসাথে ঘরে ঢুকলো একজন বলল, “আমাদের বাসায় নাকি একজন বাচ্চা আইনস্টাইন এসেছে! ঝুমু খালা তার নাম দিয়েছে, আজিব রাজীব।”

টুম্পা রাজীবের হাত ধরে বলল, “এই যে আজিব রাজীব!”

সবাই রাজীবের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। মুনিয়া কাছে এসে একবার ছুঁয়ে দেখল!

টুনি বলল, “চল ছাদে, খেলি গিয়ে!”

“কী খেলব?”

“বুদ্ধির খেলা খেলা যাবে না, তাহলে কেউ রাজীবের সাথে পারবে না! খেলতে হবে হুটোপুটি খেলা, কাড়াকাড়ি ঝাঁপাঝাঁপি খেলা।”

শান্ত বলল, “আমার ওপর ছেড়ে দাও! এমন খেলা খেলব যে কেউ আস্ত ফিরে আসবে না–শরীরের কোনো না কোনো টুকরা রেখে আসতে হবে।”

সবাই একসাথে চিৎকার করে উঠল, “ইয়েস! ইয়েস!”

যখন সবাই মিলে ছাদে উঠছে তখন মুনিয়াকে দেখা গেল বিড়বিড় করে

কী যেন বলছে। টুনি বলল, “কী বলিস মুনিয়া?”

মুনিয়া বলল, “উ-উ-উ-”

“উ-উ-উ-? মানে কী?“

“মনে নাই ছোটাচ্চু কী করবে সেটা উ দিয়ে শুরু? শব্দটা কী চিন্তা করে পাচ্ছি না।”

রাজীব মুনিয়ার কথা শুনে বলল, “উ দিয়ে তো খুব বেশি শব্দ নেই। আর কিছু একটা করা জাতীয় শব্দ তো আরো কম। এক হতে পারে উকিল না হয় উপন্যাস।”

টুনি বলল, “উকিল হবে না, ছোটাচ্চু তো উকিলের পড়া পড়ে নাই। পড়লেও ফেইল করবে।”

মুনিয়া উত্তেজিত হয়ে বলল, “তার মানে উপন্যাস! ছোটাচ্চু নিশ্চয়ই উপন্যাস লিখবে। তাই না টুনি আপু?”

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, “হ্যাঁ। ছোটাচ্চু মাঝে মাঝেই বলে যে একটা উপন্যাস লিখবে।

মুনিয়া বলল, “তাহলে আগের শব্দটা কী হবে? ‘কা’ দিয়ে শব্দ?”

রাজীব বলল, “পরের শব্দটা উপন্যাস হলে তো সোজা। তাহলে কা দিয়ে আগের শব্দটা হচ্ছে কালজয়ী! তোমার ছোটাচ্চু একটা “কালজয়ী উপন্যাস’ লিখবে!”

মুনিয়া আনন্দে চিৎকার করে উঠল, “ঠিক বলেছ! কালজয়ী উপন্যাস! কালজয়ী উপন্যাস!”

সবাই ঘুরে তাকালো, কিন্তু কেউ বেশি অবাক হলো না। এই বাসায় বেশির ভাগ কথাবার্তাই হয় চিৎকার আর চেঁচামেচি করে!

.

ছাদে চামুচ কাড়াকাড়ির একটা ভয়ংকর খেলা যখন মাঝামাঝি পর্যায়ে, সবারই হাত-পা কিংবা কনুইয়ের ছাল অল্প বিস্তর উঠে গেছে তখন ঝুমু খালা এসে খবর দিল নিচে নাস্তা দেওয়া হয়েছে এবং সবাইকে নাস্তা খাওয়ার জন্য নিচে ডাকা হচ্ছে। রাজীবের মা নাস্তা খেয়েই রাজীবকে নিয়ে চলে যাবেন।

শান্ত প্রায় হুংকার দিয়ে বলল, “এখনই চলে যাবেন মানে? আমাদের খেলা মাত্র জমে উঠেছে!”

মুনিয়া বলল, “হ্যাঁ, রাজীব ভাইয়া এখনই যেও না।”

টুম্পা বলল, “এতো তাড়াতাড়ি গিয়ে কী করবে?”

তবে নাস্তার কথা শুনে সবাই হুড়মুড় করে নিচে রওনা দিল।

নিচে বাইরের ঘরে রাজীবের মা রাজীবের চকচকে ঘামে ভেজা মুখ দেখে বেশ অবাক হলেন। বললেন, “কী হলো রাজীব? তোমার কী হয়েছে?”

“খেলছিলাম।”

“কী খেলছিলে?”

“চামুচ ছিনতাই। খুবই ইন্টারেস্টিং খেলা। কিন্তু একটু ডেঞ্জারাস।

টুম্পা বলল, “শান্ত ভাইয়া আউট না হওয়া পর্যন্ত একটু না, অনেক ডেঞ্জারাস।”

মুনিয়া বলল, “শান্ত ভাইয়া চোট্টামি করে সেই জন্যে তাকে আউট করা যায় না।

শান্ত চোখ পাকিয়ে বলল, “কী বললি? আমি চোট্টামি করি? দিব একটা চাটকানি — “

ছোটাচ্চু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, “ব্যাস অনেক হয়েছে। কাউকে কারো চাটকানি দিতে হবে না। সবাই চুপচাপ বসে নাস্তা খা।

শান্ত আস্ত একটা কাবাব মুখে ঢুকিয়ে চিবুতে চিবুতে অস্পষ্টভাবে বলল, “ঝুমু খালা কতো নাস্তা এনেছে দেখেছ?”

ছোটাচ্চু ধমক দিয়ে বলল, “মুখে খাবার নিয়ে কথা বলছিস কেন? এটা কী রকম অভ্যাস?”

প্রমি বলল, “তুমি এতো অবাক হচ্ছ কেন? এটাই তো শান্তর স্টাইল।”

শান্ত কাবাবটা গিলে ফেলে বলল, “তোমাদের যন্ত্রণায় আমি শান্তি মতো খেতেও পারি না।”

প্রমি বলল, “থ্যাংকু ঝুমু খালা এতো রকম নাস্তা বানানোর জন্য। এতো খিদে পেয়েছিল মনে হচ্ছে আস্ত ঘোড়া খেয়ে ফেলতে পারব!”

ঝুমু খালা বলল, “ঘোড়া খেতে চাইলে অন্য জায়গায় যাও! আমি তোমাগো জন্য ঘোড়া রানতে পারমু না।

ঝুমু খালার কথা শুনে সবাই অকারণে হি হি করে হাসতে থাকে। সবচেয়ে বেশি হাসে রাজীব!

রাজীবের আম্মু অবাক হয়ে রাজীবের দিকে তাকিয়েছিলেন। তার গম্ভীর টাইপের শান্তশিষ্ট ছেলেটা হঠাৎ করে কেমন জানি হাসি খুশি এবং চঞ্চল হয়ে গেছে। অন্য বাচ্চাদের মতো হইচই করছে, কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে, ধাক্কা ধাক্কি করছে, একটুতেই হেসে কুটিকুটি হয়ে যাচ্ছে। এতো অল্প সময়ে এই ছোট বাচ্চার মাঝে এতো বড় পরিবর্তন? রাজীবের আম্মু তার চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, “রাজীব, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। বাসায় যেতে হবে।”

রাজীব রস মালাইয়ের রসটা সশব্দে চুষতে চুষতে বলল, “আরো কিছুক্ষণ থাকি আম্মু? আমাদের খেলাটা শেষ করে যাব।”

রাজীবের আম্মু বললেন, “আমি কতোক্ষণ বসে থাকব? আমার কাজ শেষ।”

“তুমি চলে যাও আম্মু। গিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দাও।”

একসাথে সব বাচ্চা চিৎকার করে উঠল, “হ্যাঁ হ্যাঁ, গাড়িটা পাঠিয়ে দেন, রাজীব খেলবে আমাদের সাথে।”

কেউ যেন শুনতে না পারে সেইভাবে শান্ত ফিসফিস করে বলল, “আমিও এই পিচ্চিরে দিয়ে আমার সব হোমওয়ার্ক করিয়ে নিব!”

রাজীবের আম্মু বললেন, “ভুলে গেছ রাজীব, প্রফেসর কামরুল আজকে সন্ধেবেলা আসবেন? তোমার সাথে ফিজিক্স নিয়ে কথা বলবেন, দেখবেন তোমাকে ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের সাথে ক্লাশ করতে দেওয়া যায় কিনা?”

রাজীব বলল, “ফোন করে না করে দাও আম্মু। আমার ইচ্ছা করছে না।”

রাজীবের আম্মু চোখ কপালে তুলে বললেন, “ইচ্ছা করছে না?”

রাজীব মাথা নাড়ল, “নাহ্! এতো তাড়াহুড়ার কী আছে আম্মু? ধীরে সুস্থে অন্য সবার মতো লেখাপড়া করি। তাছাড়া–’

“তাছাড়া কী?”

“তাছাড়া আমার বেশি লেখাপড়া করার দরকার নাই। আমি ঠিক করেছি বড় হয়ে ক্রিকেট প্লেয়ার হবো।”

রাজীবের আম্মু চা খেতে খেতে বিষম খেলেন। বললেন, “ক্রিকেট পেয়ার?”

“হ্যাঁ। শান্ত ভাইয়া বলেছে আমাকে শিখিয়ে দেবে।”

শান্ত রসমালাই মাখামাখি করে খেতে খেতে জোরে জোরে মাথা নাড়ল, “শিখিয়ে দেব। আসল ক্রিকেট বল দিয়ে খেলা হবে- “

রাজীব বলল, “আর যদি ক্রিকেট প্লেয়ার না হতে পারি তাহলে বাওয়ালি হয়ে যাব।“

রাজীবের আম্মু আরো একবার বিষম খেলেন, “বাওয়ালি?”

“হ্যাঁ। সুন্দরবনে মধু আনতে যায়।”

মুনিয়া চিৎকার করে বলল, “আমিও যাব! আমিও যাব! রাজীব ভাইয়া আমাকে নিয়ে যেও। প্লিজ। প্লিজ।”

“ঠিক আছে।” রাজীব মাথা নাড়ল, “তোমাকে নিয়ে যাব।”

.

রাজীবের আম্মু যখন রাজীবকে রেখে একা একা ফিরে যাচ্ছিলেন তখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তার মহা প্রতিভাবান ছেলেটা কেমন করে হঠাৎ খুবই সাধারণ ছোট একটা বাচ্চা হয়ে গেছে। যে বাচ্চাটিকে কোনোদিন হাসতে দেখেনি সে হি হি করে হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছে, যার কখনো কোনো বন্ধু হয়নি সে অন্য বাচ্চার সাথে হুটোপুটি করছে, ধাক্কাধাক্কি করছে। যে এতদিন একটা বড় বিজ্ঞানী হবে বলে ঠিক করে রেখেছিল সে হঠাৎ করে ঠিক করে ফেলেছে বড় নৌকা করে সবাইকে নিয়ে বাওয়ালি হয়ে মধু আনতে যাবে। কী আশ্চর্য! রাজীবের আম্মু বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে এতো অল্প সময়ের মধ্যে তার ছেলের এতো বড় একটা পরিবর্তন হবে যে তাকে একা একটা অপরিচিত বাসায় কিছু বিচিত্র ছেলেমেয়ের কাছে রেখে যেতে হবে।

.

রাজীব বেশ রাতে ফিরে গেল। যাওয়ার আগে তাকে ঝুমু খালার অনেকগুলো আজব আজব অঙ্কের সমাধান করে যেতে হলো। যখনই সময় পাবে তখনই চলে আসবে সবাইকে এই কথা দিয়ে রাজীব তাদের গাড়িতে উঠল। রাজীবের পকেটে কড়কড়ে একটা নতুন দশ টাকার নোট, তার জীবনের প্রথম উপার্জন। শান্তর হোমওয়ার্ক করে দেওয়ার জন্য শান্ত গোপনে রাজীবকে এটা বখশিস হিসেবে দিয়েছে।

রাজীবকে গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্য বাসার প্রায় সবাই নিচে নেমে এসেছিল। তার গাড়িটা ছেড়ে দেওয়ার পর ছোটাচ্চু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এই টুকুন ছোট একটা বাচ্চা অথচ তাকে কত বিপদের মাঝে থাকতে হয়!"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "কী বিপদ ছোটাচ্চু?"

"পিছনে অনেক শত্রু। কখন কী করে ফেলে! এদেরকে বের করার জন্যই তো তার মা আমার কাছে এসেছিলেন।"

টুনি এদিক সেদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, "তোমাকে একটা কথা বলি ছোটাচ্চু?"

"বল।"

"তুমি রাজীবের আম্মুকে বল যেন তাকে টেলিভিশনে প্রোগ্রাম করার জন্য না হয় পত্রিকার ইন্টারভিউয়ের জন্য নেওয়ার চেষ্টা না করেন। তাহলেই দেখবে সব শত্রু নাই হয়ে গেছে!"

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে টুনির দিকে তাকাল, বলল, "তুই কেমন করে জানিস?"

টুনি বলল, “ভুলে গেছ আমি তোমার এসিস্টেন্ট? তুমি যেরকম ডিটেকটিভ, আমিও সেই রকম ডিটেকটিভ!”

ছোটাচ্চু আরেকটু কী বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখন মুনিয়া এসে চিৎকার করে বলল, “ছোটাচ্চু তুমি কী করবে আমরা বের করে ফেলেছি!”

“বের করে ফেলেছিস

“হ্যাঁ।”

“কী করব?”

“তুমি একটা উপন্যাস লিখবে। কালজয়ী উপন্যাস! ঠিক বলেছি কী না?”

ছোটাচ্চু কেমন যেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, “মানে, মানে, ইয়ে-কেমন করে বের করলি?”

“আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স!”

“আ-আ-আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স?” ছোটাচ্চু মুখ হা করে মুনিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল!

.

রাজীব যাওয়ার আগে এই বাসার বাচ্চাদের অনেক নতুন শব্দ শিখিয়ে গেছে। সময় মতো সেগুলো ব্যবহার হবে–ছোটাচ্চু সেটা তখনো জানে না!

২. স্মার্ট ফোন আসক্তি

প্রিয় ডিকেটটিভ শাহরিয়ার সাহেব।

আমার শুছেচ্ছা নিবেন। আমি ফারজানা বেগম, একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। আমি একটি বিষয়ে আপনার সাহায্য প্রার্থী।

আমার ১৪ বছরের ছেলে স্মার্টফোনে মাত্রাতিরিক্ত আসক্ত। তার আসক্তি দূর করার জন্য আমি ইন্টারনেটে খোঁজখবর নিয়ে একটি স্মার্টফোন আসক্তি দূরীকরণ কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু এই কেন্দ্রের কর্ম পদ্ধতি আমার কাছে নিষ্ঠুর এবং অমানবিক মনে হয়েছে। বিষয়টি আমি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এবং যথাযথ দপ্তরকে অবহিত করেছিলাম। অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার তারা কেউ এই নিরাময় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। এবং এই নিরাময় কেন্দ্রটি তাদের নিষ্ঠুর এবং অমানবিক পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থোপার্জন করে যাচ্ছে।

আমার একান্ত অনুরোধ আপনি এই কেন্দ্র সম্পর্কে তদন্ত করে তাদের সম্পর্কে সত্য উদ্ঘাটন করুন।

আমার ছেলের স্মার্টফোন আসক্তি নিজ থেকেই অনেকাংশে দূর হয়েছে বলে তাকে এই কেন্দ্রের সাহায্য নিতে হয় নাই।

বিনীত

ফারজানা বেগম

ছোটাচ্চু ই-মেইলটি দুইবার পড়ল। দেশে মাদকাসক্তি দূর করার জন্য নানারকম কেন্দ্র আছে জানতো কিন্তু স্মার্টফোনের যন্ত্রণা থেকে বাচ্চাকাচ্চাদের রক্ষা করার জন্যও যে নিরাময় কেন্দ্র তৈরি

শুরু হয়েছে এই ব্যাপারটা মনে হয় নতুন। ব্যাপারটা খারাপ না কিন্তু এই মহিলার ই-মেইল পড়ে মনে হচ্ছে কেন্দ্রগুলো বাড়াবাড়ি কিছু করছে! কে জানে মারধোর অত্যাচার করে কিনা।

ছোটাচ্চু খানিকক্ষণ চিন্তা করল, সে ডিটেকটিভ কাজ মোটামুটি ছেড়ে দেবে ঠিক করেছে কিন্তু ডিটেকটিভ কাজ তাকে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে না। ছোটাচ্চু তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে দাদির ঘরে গেল, দূর থেকেই বাচ্চাদের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে!

ছোটাচ্চুকে দেখেই বাচ্চারা চিৎকার করতে থাকে, "ছোটাচ্চু! ছোটাচ্চু!"

ছোটাচ্চু তার গাল ঘষতে ঘষতে বলল, "কী হলো? এভাবে চেঁচাচ্ছিস কেন? আমাকে আগে দেখিস নাই নাকি?"

একজন বলল, "দেখব না কেন? কিন্তু প্রত্যেকবার দেখলে চিৎকার দেওয়া হচ্ছে নিয়ম।"

"এই নিয়ম কে তৈরি করেছে?"

"আমরাই তৈরি করেছি।"

একজন জিজ্ঞেস করল, "ছোটাচ্চু তুমি এভাবে তোমার গাল চুলকাচ্ছে কেন? তোমার কী চুলকানি হয়েছে?"

আরেকজন বলল, "না! না! চুলকানি না। ছোটাচ্চু কিছু একটা চিন্তা করছে। ছোটাচ্চু যখন কিছু চিন্তা করে তখন এভাবে গাল চুলকায়।

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিই বলেছিস! আমি একটা জিনিস চিন্তা করছি।

"কী চিন্তা করছ ছোটাচ্চু? আমাদেরকে বলে দাও, আমরা তোমার চিন্তাটা সবাই মিলে করে দিই।"

আরেকজন বলল, "তুমি একলা একলা চিন্তা করলে সব আউলা-ঝাউলা করে ফেলবে। আমরা ঠিক ঠিক চিন্তা করে দেব।

ছোটাচ্চু একটা চেয়ারে বসে বলল, "আমি ঠিক করেছিলাম ডিটেকটিভ কাজ ছেড়ে দেব। কিন্তু ডিটেকটিভ কাজ আমাকে ছাড়ছে না। প্রত্যেক দিনই কিছু-না-কিছু কাজ চলে আসছে।"

ছোটাচ্চু এমনভাবে বলার চেষ্টা করল যে এসব কাজ চলে আসার জন্য সে খুব বিরক্ত কিন্তু তার মুখ থেকে বোঝা গেল মনে মনে ছোটাচ্চু বেশ খুশি।

শান্ত বলল, "কী কাজ বল ছোটাচ্চু। দেখি আমরা করে দিতে পারি কিনা।"

ছোটাচ্চু বলল, "একজন ভদ্রমহিলা আমাকে একটা ই-মেইল পাঠিয়েছে। তার ছেলে স্মার্টফোন এডিক্ট।"

টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "এডিক্ট মানে কী?"

শান্ত টুম্পার মাথায় একটা চাটি মেরে বলল, "গাধা! তুই এডিক্ট মানেও জানিস না? এডিক্ট মানে হচ্ছে নেশা করা। মদ, গাঁজা, ইয়াবা, ফেনসিডিল, হিরোইন এসব খেয়ে মানুষ এডিক্ট হয়।"

টুম্পা মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে একটু দূরে সরে গিয়ে বলল, "কিন্তু স্মার্টফোন খাবে কীভাবে? দাঁত ভেঙে যাবে না?"

শান্ত আরেকটা চাটি মারার জন্য উঠে যাচ্ছিল, টুনি তাকে রক্ষা করে বলল, "শান্ত ভাইয়া! কেন টুম্পাকে জ্বালাচ্ছ? সবাই তোমার মতো ড্রাগসের এক্সপার্ট না।" তারপর টুম্পার দিকে তাকিয়ে বলল, "স্মার্টফোন এডিক্ট মানে হচ্ছে যে দিন রাত স্মার্টফোন নিয়ে পড়ে থাকে। ফেসবুক করে, না হলে ইউটিউব করে।"

টুম্পা ভয়ে ভয়ে বলল, "কেন?"

প্রমি বলল, "এইটা মিলিওন ডলার প্রশ্ন। আমাদের শান্ত মনে হয় এই লাইনে যাচ্ছে। কয়দিন পরে শান্তকে জিজ্ঞেস করিস সে তখন বলে দেবে।" শান্ত হুংকার দিয়ে বলল, "কক্ষনো না। নেভার। কভি নেহি।"

প্রমি মুচকি হেসে বলল, "দেখা যাবে!"

শান্ত বলল, "যারা এমনিতেই স্মার্ট তাদের স্মার্টফোন লাগে না। যারা একটু বোকা ধরনের তাদের স্মার্টফোন ছাড়া সময় কাটে না।"

টুনি বলল, "কিন্তু আমরা ছোটাচ্চু কথাটাই এখনো শুনতে পেলাম না। ছোটাচ্চু তুমি বল। এডিক্ট ছেলের মা কী লিখেছে?"

"লিখেছে সে তার ছেলেকে একটা স্মার্টফোন আসক্তি-নিরাময় কেন্দ্রে নিয়ে গেছে। সেখানে নাকি স্মার্টফোনের আসক্তি দূর করার জন্য টর্চার করে!"

শাহানা বলল, "টর্চার?"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, "তাইতো লিখেছে। নিষ্ঠুর এবং অমানবিক কর্ম পদ্ধতি, সোজা বাংলায় টর্চার!"

টুম্পা বিড়বিড় করে বলল, "সোজা বাংলা না সোজা ইংরেজি?"

শান্ত একটা ধমক দিল, "তুই চুপ করবি?" তারপর ছোটাচ্চুকে জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে টর্চার করে ছোটাচ্চু?"

"সেইটা লিখে নাই।"

"মনে হয় শক্ত একটা স্মার্টফোন দিয়ে মাথায় বাড়ি দিতে দিতে রক্ত বের করে ফেলে!"

বাচ্চাদের কথাবার্তার জন্য দাদি তার টেলিভিশনে মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। শান্তর কথা শুনে বিরক্ত হয়ে বললেন, "কী আজেবাজে কথা বলিস তুই শান্ত? একদিন একটা ভালো কথা বলতে পারিস না?"

স্মার্টফোন দিয়ে টর্চার করার আরেকটা ফিচলে বুদ্ধি শান্তর মাথায় এসেছিল কিন্তু দাদির ধমক খেয়ে সে আর সেটা বলার সাহস করল না।

টুনি বলল, "তোমাকে কী করতে হবে সেটা এখনো বল নাই ছোটাচ্চু।"

"তোরা আমাকে বলতে দিলে তো বলব? আমাকে তো কথাই বলতে দিচ্ছিস না।"

টুনি বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন সবার কথা বন্ধ। এখন ছোটাচ্চু কথা বলবে।"

সবাই চুপ করল। তখন ছোটাচ্চু বলল, "স্মার্টফোন এডিক্টর মা ব্যাপারটা পুলিশ র‍্যাব সবাইকে জানিয়েছে কিন্তু তারপরও এই নিরাময় কেন্দ্রকে কেউ ধরছে না। তারা ব্যবসা করে যাচ্ছে।

“কেউ তাদের ধরছে না কেন?”

“সেইটাই ভদ্রমহিলা বুঝতে পারছে না। আমাকে বলেছে আমি রহস্য উদ্ঘাটন করে দিতে পারব কি না।

টুনি বলল, “তুমি কী রাজি হয়েছ?”

“এখনো কিছু বলি নাই। রাজি হব কি না বুঝতে পারছি না। ডিটেকটিভ কাজ করতে আর ইচ্ছা করে না।”

শান্ত জিজ্ঞেস করল, “কতো টাকা দিবে বলেছে?”

ছোটাচ্চু বিরক্ত হয়ে বলল, “এখানে টাকার কথা কেন আসছে?”

শান্ত চোখ কপালে তুলে বলল, “কী আশ্চর্য। টাকার কথা না আসলে কিসের কথা আসবে? আগে টাকার কথা তারপর অন্য কিছু!”

শাহানা বলল, “অনেক হয়েছে শান্ত, এখন চুপ কর।”

শান্ত গরম হয়ে বলল, “অনেক হয়েছে মানে কী? আমি তো কিছু বললামই না। ছোটাচ্চুর ডিটেকটিভ এজেন্সি ফেল মেরেছে কেন? কারণ–”

ছোটাচ্চু চোখ লাল করে বলল, “মোটেও ফেল মারে নাই। ঐ বদমাইশ সরফরাজ কাফী ষড়যন্ত্র করে আমার এজেন্সি দখল করেছে!”

“একই কথা। এর পিছনেও আছে টাকা! টাকা এবং টাকা! সবার প্রথমে তুমি জিজ্ঞেস করবে কত টাকা পাবে। তারপর ঠিক করবে

তুমি কাজ নিবে কিনা। তোমার যদি লজ্জা লাগে আমাকে ই-মেইল এড্রেসটা দাও আমি একটা ই-মেইল পাঠাই।”

শাহানা বলল, “শান্ত, তুই বড় হয়ে কী করিস সেটা দেখার আমার খুব ইচ্ছা।”

শান্ত বুকে থাবা দিয়ে বলল, “সবচেয়ে কম বয়সে বিলিওনিয়ার হব, দেখে নিও।”

প্রমি বলল, “উঁহু। তুই সবচেয়ে কম বয়সে দুর্নীতির দায়ে জেলে যাবি।”

শান্ত বলল, “ভালো হবে না। ভালো হবে না কিন্তু।”

ছোটাচ্চু আর পারল না। সে উঠে তার গাল ঘষতে ঘষতে নিজের রুমের দিকে রওনা দিল। দাদি (কিংবা নানি) একটা হুংকার দিলেন, “তোরা চুপ করবি একটু? চুপ করবি?”

বাচ্চারা কয়েক সেকেন্ডের জন্য চুপ করল তারপর আবার চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

.

ছোটাচ্চু পিছু পিছু টুনিও তার ঘরে চলে এসেছে। টুনি জিজ্ঞেস করল, “ছোটাচ্চু তুমি কাজটা নিবে কিনা কখন ঠিক করবে?”

“বুঝতে পারছি না।”

“কিন্তু শুধু ই-মেইলে কয়েক লাইন পড়ে কি আর ঠিক করতে পারবে? তোমার ঐ ছেলের মায়ের সাথে কথা বলা দরকার না?

ছোটাচ্চু মাথা চুলকে বলল, “আমিও তাই ভাবছিলাম।”

“আমার মনে হয় তুমি তার সাথে কথা বল। সবচেয়ে ভালো হয় যদি তাকে এই বাসায় আসতে বল। তাহলে ভালো করে কথা বলতে পারবে!”

আসলে এই বাসায় এসে কথা বললে বাচ্চারা সবাই জানালার নিচে উবু হয়ে বসে পুরো কথাবার্তা শুনতে পারবে! বাচ্চারা ছোটাচ্চুর ডিটেকটিভ কাজের গোপন কথাবার্তা শুনতে খুব পছন্দ করে।

.

তাই দুদিন পর সত্যিই দেখা গেল স্মার্টফোন এডিক্টের মা চলে এসেছে, বাইরের ঘরে বসে ছোটাচ্চু সাথে কথা বলছে এবং বাচ্চারা লুকিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনছে।

ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, “আপনি কীভাবে জানেন এডিকশান দূর করার জন্য নিষ্ঠুর কাজকর্ম করা হয়?”

“সিসি ক্যামেরায় দেখেছি।”

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, “নিজে দেখেছেন?”

“হ্যাঁ। মনে হয় ভুলে দেখিয়ে ফেলেছে। এরকম বিষয় দেখানোর কথা না।”

“কী দেখেছেন?”

ভদ্রমহিলা নড়েচড়ে বসে বলল, “প্রথমে ছেলেটাকে একটা চেয়ারে বেল্ট দিয়ে বেঁধেছে যেন নড়তে চড়তে না পারে। শুধু

একটা হাত খোলা। সেই হাতে একটা স্মার্টফোন দিয়েছে। নিশ্চয়ই তাকে বলেছে স্মার্টফোনটা দেখতে। সিসি ক্যামেরায় কথা শোনা যায় না, তাই অনুমান করছি। ছেলেটা যেই স্মার্টফোনটা তুলে দেখেছে ওমনি ইলেকট্রিক শক?"

"ইলেকট্রিক শক?"

"হ্যাঁ। কাছেই একটা প্যানেল সেখানে সুইচ নব এসব। সুইচটা চাপ দেয় সাথে সাথে ছেলেটা কেঁপে উঠে। প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর বাড়াতে থাকে। ছেলেটার রীতিমতো খিঁচুনি হতে থাকে। কোনো মায়া দয়া নেই!"

ছোটাচ্চু চোখ বড় বড় করে বলল, "কী সর্বনাশ!"

"শেষের দিকে ছেলেটা আর স্মার্টফোনের দিকে তাকাতে চায় না তখন জোর করে তার চোখ খুলে চোখের সামনে স্মার্টফোনটা ধরে রেখে ইলেকট্রিক শক দেয়।" মহিলা মাথা নেড়ে বলল, "আমি শেষের দিকে দেখতে পারছিলাম না। ঘরে অন্য যারা ছিল সবারই একই অবস্থা!"

ছোটাচ্চু জিজ্ঞেস করল, "আপনি ওদের সাথে কথা বলেন নাই?"

"বলেছি।"

"তারা কী বলে?"

"তারা বলে এটা নাকি আসক্তি নিরাময়ের স্ট্যান্ডার্ড টেকনিক। তারা কোনো দোষ দেখে না। তারা বলে সারা পৃথিবীতে নাকি এভাবে এডিকশান দূর করা হয়। এভাবে বেশ কিছুদিন চালিয়ে

গেলে স্মার্টফোন দেখলেই ছেলেটার মনে হবে সে ইলেকট্রিক শক খাচ্ছে। ভয়ের চোটে আর স্মার্টফোন ধরবে না।

ছোটাচ্চু মাথা নড়ল, বলল, "কী সর্বনাশ!"

ভদ্রমহিলা আরো কিছুক্ষণ কথা বলল। যাওয়ার সময় একটা খাম টেবিলে রেখে বলল, "আমি জানি না আপনার ফি কত কিংবা কীভাবে ফি দিতে হয়। তাই এই খামে কিছু সম্মানি রেখে গেলাম আর কত দিতে হবে জানাবেন।

জানালার নিচে লুকিয়ে থাকা শান্ত হাতে কিল মেরে ফিসফিস করে বলল, "ইয়েস!"

কিন্তু ছোটাচ্চুর কথা শুনে তার পুরো উত্তেজনা দপ করে নিভে গেল। ছোটাচ্চু বলল, "না-না-না। আমি এসব কাজে মোটেও এডভান্স নিই না। যদি কাজ নিই, কাজ শেষ হওয়ার পর যদি পেমেন্ট করতে হয় তখন দেখা যাবে।'

ভদ্রমহিলা আরেকটু জোর করল কিন্তু ছোটাচ্চু রাজি হলো না। শান্তর যা মেজাজ খারাপ হলো সেটা বলার মতো না।

স্মার্টফোন এডিক্টের মা চলে যাবার পর শান্ত ছোটাচ্চুকে বলল, "ছোটাচ্চু তোমার কোনো আশা নাই। তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না।"

প্রমি বলল, "ছোটাচ্চু তুমি শান্তর কথাকে কোনো গুরুত্ব দিও না। তুমি যেটা করেছ ঠিকই করেছ।"

মুনিয়া সবচেয়ে ছোট, সে রিনরিনে গলায় বলল, "টাকার পিছনে ছুটতে হয় না। টাকাই তোমার পিছনে ছুটবে!"

ছোটাচ্চু চোখ কপালে তুলে বলল, “তুই এই দার্শনিকের কথা কোথা থেকে শিখেছিস?”

মুনিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, “আমাদের স্যার বলেছে।”

“স্যার কী করে?”

“স্যারের বিশাল কোচিং সেন্টার আছে।”

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, “এই জন্যই টাকা তার পিছু পিছু ছুটছে।”

শাহানা বলল, “টাকার কথা বাদ দাও ছোটাচ্চু। তুমি এই কাজটা নিবে কি না বল।”

একসাথে অন্য সবাই বলল, “নিতেই হবে ছোটাচ্চু। নিতেই হবে। ছোটাচ্চু মাথা চুলকে বলল, “ভেবে দেখি।”

সবাই কিছু-না-কিছু বলছে শুধু টুনি কোনো কথা না বলে চুপচাপ কিছু একটা ভাবতে থাকে। তার শুধু মনে হয় একটা প্যানেলে সুইচ আর নব, সেই সুইচ টিপে নব ঘুরিয়ে মানুষকে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার ব্যাপারটা সে জানি আগে কোথায় দেখেছে। কোথায় দেখেছিল সে মনে করতে পারছিল না। ভুরু কুঁচকে টুনি চিন্তা করতে থাকে। হঠাৎ করে তার মনে পড়ে গেল। সাথে সাথে সে খাওয়া শেষ করে ছোটাচ্চুর কাছে ছুটে গেল। ছোটাচ্চু টুনিকে এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে টুনি?”

“তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

“কী কথা?”

“স্মার্টফোন এডিক্টদের জন্য যে জায়গাটা আছে সেখানে তোমার যেতে হবে।”

“আমার যেতে হবে?”

“হ্যাঁ। আমাকে নিয়ে যাবে।”

“তোকে?”

“হ্যাঁ।”

“কেন?”

“তুমি গিয়ে বলবে আমি স্মার্টফোনে এডিক্ট। তুমি আমাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এসেছ।

“তুই এডিক্ট?” ছোটাচ্চু শব্দ করে হেসে ফেলল।

“আসলে তো না, আমি শুধু ভান করব। একটা স্মার্টফোন নিয়ে যাব সারাক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে থাকব-ওরা বিশ্বাস করবে।”

“ঠিক আছে সেটা না হয় বিশ্বাস করানো গেল, কিন্তু তাতে লাভ কী?”

“আমাকে নিয়ে গেলেই তুমি টের পাবে। শুধু আমি যেটা বলব তুমি সেটা মেনে নেবে। “

ছোটাচ্চু একটু দুশ্চিন্তিত হয়ে বলল, “কিন্তু যদি সত্যি সত্যি তোকে ইলেকট্রিক শক দিতে শুরু করে–”

“সেটা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না ছোটাচ্চু। আমি সেটা দেখব।

এখন পর্যন্ত টুনি ছোটাচ্চুর ডিটেকটিভ কাজকর্মে বড় কিংবা ছোট কোনো অঘটনই ঘটায়নি। তাই তার কথা শুনলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। তারপরেও জেনে শুনে ইলেকট্রিক শক খেতে যাওয়াটা কতটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে ছোটাচ্চু বুঝতে পারল না।

ছোটাচ্চু ইতঃস্তত করছে টের পেয়ে টুনি অনুনয় করে বলল, “প্লিজ প্লিজ ছোটাচ্চু আমাকে নিয়ে যাও। আর কিছু যদি নাও হয় তুমি তদন্ত করার সুযোগ পাবে। প্লিজ প্লিজ ছোটাচ্চু! প্লিজ।”

ছোটাচ্চু শেষ পর্যন্ত রাজি হলো।

.

তাই দুদিন পর ছোটাচ্চু স্মার্টফোন আসক্তি দূরীকরণ কেন্দ্রে টুনিকে নিয়ে হাজির হলো। বাইরে কোনো সাইনবোর্ড নেই, বিল্ডিংটাকে দেখেও কেমন জানি বাসা বাসা মনে হয়। লিফটে করে পাঁচ তলা গিয়ে এপার্টমেন্টটা খুঁজে বের করে কলিংবেলে চাপ দিল। কিছুক্ষণ পর একজন কম বয়সী মানুষ দরজা খুলে দিল, তাদেরকে ঢুকতে না দিয়ে মুখে প্রশ্ন ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী ব্যাপার?”

ছোটাচ্চু বলল, “এটা স্মার্টফোন আসক্তি দূরীকরণ কেন্দ্র না?”

“জী।”

“আমি আমার ভাতিঝিকে নিয়ে এসেছি। তার সিরিয়াস এডিকশান।”

বিষয়টাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য টুনি ছোটাচ্চুর স্মার্টফোনটার দিকে দৃষ্টি রেখে কান খাড়া করে রেখেছে।

মানুষটা টুনিকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল, জিজ্ঞেস করল, "বয়স কত?"

"তেরো।"

"এত কম বয়সে স্মার্টফোন দেওয়া ঠিক হয় নাই।"

ছোটাচ্চু বলল, "যাই হোক সেটা অন্য ব্যাপার। এখন আমি আপনাদের সার্ভিস নিতে এসেছি।"

মানুষ দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলল, "আসেন।"

ছোটাচ্চু টুনিকে নিয়ে একটা করিডোর ধরে মানুষটার পিছু পিছু হেঁটে গেল। করিডোরের শেষ মাথায় একটা রুমের দরজা খুলে ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে মানুষটা বলল, "আরো একজন এডিক্ট এসেছে।"

ভিতর থেকে কেউ একজন কিছু একটা বলল, তখন মানুষটা দরজা থেকে সরে গিয়ে তাদের ঢোকার জায়গা করে দিল। ভিতরে খুবই সাদামাটা একটা টেবিলে কিছু কাগজপত্র। টেবিলের পিছনে একটা সাদামাটা চেয়ারে কমবয়সী একজন মানুষ বসে আছে। মানুষটার চোখে চশমা, গলায় একটা স্টেথিস্কোপ এবং পরনে সাদা এপ্রন। মানুষটা ভুরু কুচকে টুনিকে দেখল। টুনিও তাকে এক নজর দেখে আবার তার স্মার্টফোনে ফিরে গেল। মানুষটা বলল, "এই যে মেয়ে, তুমি কী এখন তোমার স্মার্টফোনটা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখবে?"

টুনি হতাশার একটা ভঙ্গী করে স্মার্টফোনটা ছোটাচ্চুর হাতে দিল। মানুষটা ছোটাচ্চুর দিকে তাকাল, তারপর বলল, "বসেন।" ছোটাচ্চু এবং টুনি বসল। মানুষটা বলল, "আমরা কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?"

ছোটাচ্চু বলল, "ইন্টারনেটে আপনাদের ওয়েবসাইট দেখে আমরা আপনার সেন্টারে এসেছি। টুনিকে দেখিয়ে বলল, "আমার ভাতিঝি। আমরা টের পাইনি, তার সিরিয়াস সমস্যা–"

টুনি আপত্তি করে বলল, "মোটেও সিরিয়াস সমস্যা নয়। সবাই তো করে।"

ছোটাচ্চু কঠিন গলায় বলল, "তুই চুপ করবি? আমাকে কথা বলতে দে।"

টুনি ছোটাচ্চুর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলো। সেও অভিনয় করে ঠোঁট ওল্টালো, তারপর এদিক সেদিক দেখতে লাগল। ছোটাচ্চু একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "আপনাদের সার্ভিস নেওয়ার আগে আমার কয়েকটা বিষয় জানা দরকার। ঠিক কীভাবে আপনারা সমস্যা দূর করার চেষ্টা করেন। কয়টা সেশন নিতে হয়, কতদিন লাগে। আপনাদের কত পার্সেন্ট ক্লায়েন্ট ভালো হয়, আবার রিলান্স করে কিনা। আপনাদের অরগানাইজেশন অনুমোদিত কিনা—"

মানুষটা হাসিহাসি মুখে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে রইল, মনে হলো সে ছোটাচ্চুর কথাগুলি শুনে খুবই আনন্দ পাচ্ছে। তারপর ড্রয়ার খুলে একটা টাইপ করা কাগজ বের করে ছোটাচ্চুর হাতে দিয়ে বলল, "আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের এই ফর্মে আছে। ফর্মটা পড়ে সেটা ফিল-আপ করে আমাদের দেন।

ছোটাচ্চু জানতে চাইল, “এখনই ফিল-আপ করব?”

“হ্যাঁ, এখনই করেন। পাশে আমাদের ওয়েটিং রুম আছে সেখানে ডেস্ক আছে, ফর্ম ফিল-আপ করতে সুবিধা হবে। আপনারা অপেক্ষা করেন সময় হলে আমরা ডেকে নেব।“

ছোটাচ্চু উঠে দাঁড়াল, টুনিও উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, “আপনারা কী ব্যথা দেবেন?”

মানুষটা শব্দ করে হাসল, বলল, “ব্যথা বলতে কী বোঝাও তার ওপর নির্ভর করে!”

যখন দরজা খুলে বের হয়ে যাবে ঠিক তখন হঠাৎ করে মানুষটা বলল, “আচ্ছা, একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি?”

ছোটাচ্চু দাঁড়িয়ে গেল। মানুষটা বলল, “আপনাকে কী আমি আগে কখনো দেখেছি?”

ছোটাচ্চু বলল, “দেখার কথা না। হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে গেলেও মনে থাকার কথা না। মনে হয় আমার চেহারার কোনো ক্রিমিনাল ধরা পড়েছে, পত্রপত্রিকায় ছবি ছাপা হয়েছে সেটা আপনার মনে গেঁথে গেছে–”

ছোটাচ্চুর রসিকতা শুনে মানুষটা হা হা করে হাসার ভান করল, যদিও টুনি টের পেলো হাসিটা মোটেও আন্তরিক হাসি না!

টুনি আর ছোটাচ্চু পাশের ঘরে গিয়ে দেখল সেখানে বেশ কিছু মানুষ বসে আছে। কমবয়সী ছেলে এবং মেয়ে এবং তাদের পাশে বাবা কিংবা মা। ছেলে মেয়েগুলোর চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ,

বাবা মায়ের মুখে একটুখানি হতাশার চিহ্ন এবং অনেকখানি ভয়ের চিহ্ন।

টুনিকে নিয়ে ছোটাচ্চু একটা খালি ডেস্কে বসে ফর্মটা ফিল-আপ করতে শুরু করল। অনেক বড় ফর্ম, অনেক কিছু লিখতে হয়। দুইজন মিলে বানিয়ে বানিয়ে সেগুলো লেখা শুরু করল। হঠাৎ দেওয়ালে ঝোলানো একটা টিভি স্ক্রিনে একটা ছবি ভেসে উঠল। ছবিটা কয়েকবার কেঁপে কেঁপে ওঠে স্থির হয়ে যায়। তারপর আবার চলতে শুরু করে। এটা সিসি টিভি, ভেতরের কোনো একটা ল্যাবরেটরির দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ছোটাচ্চুকে স্মার্টফোন এডিক্টের মা যেরকম বলেছিল ঠিক সেরকম। সেই ভদ্রমহিলা একটা ছেলের কথা বলেছিল, এখানে একটি চৌদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে। মেয়েটাকে ডেন্টিস্টের চেয়ারের মতো একটা চেয়ারে বসিয়েছে, তারপর দুই হাত দুই পা চেয়ারের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে ফেলেছে। মেয়েটা খুব ভয় পাচ্ছে বলে মনে হলো না, মুখে এক ধরনের তাচ্ছিল্যের হাসি। বুকের উপর দিয়ে আরেকটা বড় স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধেছে। তারপর শরীরের কয়েক জায়গায় মনিটর লাগিয়েছে। কপালের দুই পাশেও মনিটর লাগিয়েছে। সেই মনিটরের সিগন্যালগুলোও দেখা গেল।

কঠিন চেহারার একজন মহিলা একটা কন্ট্রোল প্যানেলের উপর ঝুঁকে পড়েছে। প্যানেলের পিছন থেকে মহিলাটি কয়েকটা বড় বড় তার বের করল। সেখান থেকে দুটো তার এনে মেয়েটার পায়ের গোড়ালির উপর লাগালো, অন্য দুটি দুই হাতের কব্জির কাছে। মেয়েটার সাথে যে মানুষটা এসেছে তাকে বাইরে যেতে বলা হলো, মানুষটা প্রথমে রাজি হলো না, একটু তর্কাতর্কি হলো তারপর একটু রাগারাগি হলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বাইরে চলে যেতে হলো।

কঠিন চেহারার মহিলাটি মেয়েটার হাতে একটা স্মার্টফোন দিল। হাত বাঁধা থাকলেও স্মার্টফোনটা ধরা যায়, তারপর মেয়েটাকে কিছু একটা বলল। মেয়েটা মাথা নাড়ল। স্মার্টফোনটা চালু করে মেয়েটা সেটার দিকে তাকায়, এক হাতেই বেশ দক্ষভাবে সেটাকে টেপাটেপি করতে থাকে। টুনি তীক্ষ্ণ চোখে কঠিন চেহারার মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকে। মহিলা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থেকে কন্ট্রোল প্যানেলে একটা নব ঘোরালো তারপর একটা সুইচে চাপ দিল, সাথে সাথে মেয়েটার শরীর কেমন যেন ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। সে একটু অবাক হয়ে মহিলার দিকে তাকালো, মহিলাকে কিছু একটা বলল। মহিলা মাথা নাড়ল, মেয়েটাকে কিছু একটা বলল, মেয়েটা খুবই অনিচ্ছার সাথে হাতের স্মার্টফোনটার দিকে তাকালো। তার মুখের সেই তাচ্ছিল্যের হাসিটা এখন নেই, মুখে একটা ভয়ের ছাপ। মহিলা আবার নবটা ঘুরিয়ে সুইচে চাপ দিল, সাথে সাথে মেয়েটার শরীর কেমন জানি ঝটকা দিয়ে উঠল, এবারে আগের থেকে বেশি। মনে হয় একটা আর্তচিৎকারও করল, কিন্তু সিসি টিভিতে কোনো শব্দ শোনা গেল না।

মেয়েটা এখন আর তার স্মার্টফোনের দিকে তাকাতে চাইছে না। জোরে জোরে মাথা নাড়ছে কিন্তু কঠিন চেহারার মহিলাটা জোর করল, মেয়েটা তখন তাকাল আর সাথে সাথেই ইলেকট্রিক শক। এবারে নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি একটা শক, মেয়েটার পুরো শরীর বাঁকা হয়ে যায়, এক ধরনের খিঁচুনি দিতে থাকে, খিঁচুনিটা থামতেই চায় না।

ছোটাচ্চু ভয়ের একটা চাপা শব্দ করে টুনির দিকে তাকাল, অবাক হয়ে দেখল টুনির মুখের একটা চাপা হাসি। ছোটাচ্চু অবাক হয়ে ফিসফিস করে বলল, “কী হলো? তুই হাসছিস কেন?”

টুনি ছোটাচ্চুর কানের কাছে মুখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "বুঝতে পারছ না? পুরোটা ভূয়া। একটিং।"

"একটিং?"

"হ্যাঁ।"

"তুই কেমন করে জানিস?"

"আগেই সন্দেহ করেছিলাম, এখন দেখে বুঝতে পারছি।"

"কীভাবে বুঝতে পেরেছিস?"

টুনি খুবই চাপা গলায় বলল, "যখন মহিলাটা সুইচে চাপ দেয় আর যখন মেয়েটা শক খায় সেই টাইম মিলাতে পারছে না। একটু আগে পরে হচ্ছে। তুমি দেখো।"

ছোটাচ্চু টুনির কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না কিন্তু এবারে একটু ভালো করে লক্ষ করল, দেখল সত্যি সত্যি মহিলাটা সুইচে চাপ দেওয়ার আগেই মেয়েটা হঠাৎ প্রচণ্ড শক খেয়ে ছটফট করা শুরু করেছে। এমনভাবে মেয়েটা যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে যে সেটা দেখে ঘরের সবাই আতংকে চিৎকার করে উঠে। কয়েকজন ভয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছে, কয়েকজন দাঁড়িয়ে গিয়ে বলছে, "কী হচ্ছে এসব? কী হচ্ছে এখানে?"

শুধু টুনি পরের দৃশ্যটা দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। কেউ লক্ষ করল না, শুধু টুনি দেখল হঠাৎ হঠাৎ মেয়েটার মুখে একটা দুষ্টু হাসি খেলা করে উঠে। টুনিকে স্বীকার করতেই হলো মেয়েটা খুবই ভালো অভিনয় করছে।

এবারে মেয়েটা কিছুতেই স্মার্টফোনটা দেখতে চাইছে না– রীতিমতো জোর করে হাতে ফোনটা ধরিয়ে মহিলা ইলেকট্রিক শক দিতে এগিয়ে গেল। টুনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, মহিলাটি সুইচে চাপ দিয়েছে, মেয়েটার একটু দেরি হলো তারপর হাত থেকে স্মার্টফোন ছুঁড়ে দিয়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে। দেখে ভয় লেগে যায়–অনবদ্য অভিনয়।

এবারে ঘরের সবাই উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। সিসি টিভিটা বন্ধ হয়ে গেল এবং দরজা খুলে পাশের ঘরের সাদা গাউন পরা কম বয়সী মানুষটা উঁকি দিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

প্রায় সবাই একসাথে কথা বলার চেষ্টা করে, তাই কারো কথাই ভালো করে বোঝা গেল না। তখন একজন বয়স্ক মানুষ অন্য সবাইকে থামিয়ে বলল, "আমাকে বলতে দিন।"

সবাই থামল, তখন বয়স্ক মানুষটা বলল, "আমরা আপনাদের ট্রিটমেন্টের প্রসেস দেখে হতবাক। এটা ইনহিউম্যান, এটা ক্রিমিনাল-

সাদা গাউন পরা মানুষটা হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, "দেখলে একটু অস্বস্তি হয় আসলে এমন কিছু ব্যাপার না। এটা খুবই কমন টেকনিক। ঠিক আছে এখন থেকে সিসি ক্যামেরা বন্ধ রাখব, আপনাদের দেখতে হবে না।

একজন বলল, "সিসি ক্যামেরা বন্ধ রাখলেই তো আর ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাচ্ছে না।"

আরেকজন বলল, "পুলিশকে খবর দেওয়া উচিত। নিউজ মিডিয়াকে খবর দেওয়া উচিত!"

কম বয়সী মানুষটা একটুও বিচলিত হলো না, বলল, "মোস্ট ওয়েলকাম। খবর দিতে চাইলে খবর দেন। আপনাদের ইচ্ছা। এখন বলেন, নেক্সট কে ট্রিটমেন্ট নেবে?"

ছেলেমেয়েগুলো একসাথে চিৎকার করে উঠল, "আমি নেব না। মরে গেলেও নেব না।"

মানুষটা খুবই অবাক হলো। বলল, "কেউ নেবে না?"

"না।"

বয়স্ক মানুষটা বলল, "আমাদের তো আর মাথা খারাপ হয় নাই যে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের এভাবে টর্চার করব।"

"না?"

মানুষটা তবু আশা ছাড়ল না। বলল, "তাই বলে কেউ ট্রিটমেন্ট নিবে না?"

টুনি তখন উঠে দাঁড়াল, বলল, "আমি নেব।"

সবাই চমকে উঠল। সবচেয়ে বেশি চমকালো গাউন পরা কম বয়সী মানুষটা। আমতা আমতা করে বলল, "তু-তুমি নেবে?"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ।"

"সত্যি? সত্যি তুমি নিতে চাও?"

"হ্যাঁ।"

ঘরের সবাই হা করে তাকিয়ে আছে। কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না, নিজের চোখে দেখার পরও কেউ এরকম একটা ভয়ংকর ব্যাপারের ভিতর দিয়ে যেতে চাইবে!

গাউন পরা মানুষটাও বিশ্বাস করল না। চোখ বড় বড় করে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনিও তাকে দিতে চান?"

ছোটাচ্চু দাঁড়িয়ে বলল, "এতো করে যখন চাইছে–"

"কিন্তু কিন্তু –" মানুষটা কথা শেষ করতে পারল না।

মধ্যবয়স্ক মানুষটা এবারে ছোটাচ্চু দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু কেন চাইছে?"

টুনি এবারে কথা বলল, "তার কারণ পুরো ব্যাপারটা ভূয়া।" ঘরের সবাই চিৎকার করে উঠল, "ভূয়া?"

টুনি গাউন পরা মানুষটার দিকে তাকাল, তাকে জিজ্ঞেস করল, "তাই না ডাক্তার আংকেল?"

মানুষটা একবার খাবি খেলো। ছোটাচ্চুর দিকে তাকালো তারপর টুনির দিকে তাকালো, তারপর আবার ছোটাচ্চুর দিকে তাকালো, তারপর বলল, "এই বারে আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি ডিটেকটিভ শাহরিয়ার। আর এই মেয়ে হচ্ছে আপনার এসিস্টেন্ট টুনি! আপনারা গাবড়া বাবাকে ধরেছিলেন।"

ঘরের মানুষজন এবারে ছোটাচ্চু আর টুনিকে ভালো করে দেখার জন্য এগিয়ে আসে–নিজেদের মাঝে কথা বলে। ছোটাচ্চু বলল, "আপনি কিন্তু আমার এসিস্টেন্টের প্রশ্নের উত্তর দেননি! বলেন, পুরো ব্যাপারটা কী আসলেই ভূয়া?

মানুষটা আমতা আমতা করে বলল, "আসলে, আসলে–এটা বলতে পারেন একটা সোস্যাল সার্ভিস। সিসি টিভির ভিডিওটা দেখে অনেকে স্মার্টফোন থেকে সরে আসে, সেই জন্য প্রফেশনাল এক্টর এক্ট্রেস দিয়ে—

ছোটাচ্চু বাক্যটা শেষ করল "একটা ভূয়া ভিডিও বানিয়ে রেখেছেন!"

"আমার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নাই। আমার উদ্দেশ্য মহৎ"

মধ্যবয়স্ক মানুষটা গর্জন করে বলল, "মহৎ উদ্দেশ্যে প্রতারণা করা যায় না। ফাজলামো পেয়েছেন?"

ঘরের মাঝে কমবয়সী ছেলেমেয়েগুলো হুংকার দিয়ে বলল, "পুরো ল্যাব জ্বালিয়ে দিব। জ্বালিয়ে শেষ করে দেব।"

টুনি আস্তে আস্তে বলল, "আমার মনে হয় জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য কোনো ল্যাব নাই। কিছু নাই!"

গাউন পরা মানুষটা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিকই বলেছ। নাই, কিছু নাই।"

ষণ্ডা টাইপের একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, "তাহলে এই ঘর আর অফিসটাই ভাংচুর করে যাই।" সে যে আসলই ভাংচুর করার জন্য রেডি সেটা বোঝাবার জন্য একটা চেয়ার তুলে নেয়।

গাউন পরা মানুষটা এবারে ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে কাতর গলায় বলল, "শাহরিয়ার সাহেব! প্লিজ এদেরকে একটু বোঝান আমার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নাই, আমি এখান থেকে কোনো টাকা কামাই করি না, জাস্ট একটু ফান–"

ছোটাচ্চু বলল, “প্রতারণা করে ফান হয় না। যাইহোক আপনি যান, আমি দেখছি।”

টুনি ভেবেছিল মানুষটা বুঝি শুধু ঘর থেকে বের হয়ে যাবে। কিন্তু দেখল শুধু ঘর থেকে নয়, বাইরের দরজা খুলে খুবই তাড়াতাড়ি একেবারে বাসার বাইরে চলে গেল। একা নয়–একসাথে তার এসিটেন্টও! সহজে ফিরে আসবে বলে মনে হয় না!

ছোটাচ্চু তখন কথা বলে সবাইকে শান্ত করল, তাদেরকে বলল সে এসেছেই তদন্ত করার জন্য! তদন্ত করার কিছু নাই, পুরো ব্যাপারটাই একটা রসিকতার মতো। মানুষটা অন্তত একটা কথা সত্যি বলেছে, সে এখান থেকে কোনো টাকা কামাই করেনি। করার কথা না!

সবাই মোটামুটি শান্ত হলো, একটু হাসাহাসি হলো এবং তখন টুনি আর ছোটাচ্চুকে বেশ কিছু সেলফি তুলতে হলো।

.

ফিরে আসার সময় ছোটাচ্চু টুনিকে জিজ্ঞেস করল, “তুই কেমন করে অনুমান করেছিলি এটা ভূয়া হতে পারে? আমি তো বুঝতেই পারিনি!”

টুনি বলল, “মিলগ্রাম নামে একজন সাইকোলজিস্টের এরকম একটা বিখ্যাত এক্সপেরিমেন্ট আছে, ভূয়া ইলেকট্রিক শক দেওয়ার এক্সপেরিমেন্ট।”

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, “তুই সেটার কথা কেমন করে জানলি?”

“আম্মু একবার একটা বই এনেছিল। অনেক মজার মজার ছবি ছিল। সেখানে দেখেছিলাম।”

বাসায় এসে যখন সবাইকে ঘটনাটা বর্ণনা করা হলো তখন শান্ত হাতে কিল দিয়ে বলল, “ফ্যান্টান্টিক আইডিয়া!”

শাহানা অবাক হয়ে বলল, “কোনটা ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া?”

“এই যে স্মার্টফোন আসক্তি দূর করার সেন্টার। আমরা আমাদের বাসায় এটা খুলতে পারি। আমরা আগেই টাকা নিয়ে নেব। সার্ভিস না নিলে টাকা ফেরত দেওয়া হবে না। শাহানা আপু ভূয়া শক দেওয়ার যন্ত্র বানিয়ে দেবে। ঝুমু খালা হবে ডাক্তার আমি শক খাওয়ার ভান করব।”

টুম্পা জিজ্ঞেস করল, “তুমি পারবে শান্ত ভাইয়া?”

‘পারব না কেন? দেখাবো করে?

টুম্পা উৎসাহ নিয়ে বলল, “দেখাও শান্ত ভাইয়া!’

তখন শান্ত ইলেকট্রিক শক খাওয়ার যা একটা অভিনয় করে দেখাল সেটা আর বলার মতো নয়!

৩. মিশু কাহিনী

টুনি স্কুলের বারান্দায় বসে অন্যমনস্কভাবে স্কুলের মাঠের দিকে তাকিয়ে ছেলেমেয়েদের চিৎকার চেঁচামেচি করে খেলতে দেখছিল। তাই প্রথমে লক্ষ করেনি একটা মেয়ে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বয়সে তার থেকে তিন চার বছর ছোট হবে, নার্ভাসভাবে তার জামার একটা অংশ হাতে পেচাচ্ছে আবার খুলে

ফেলছে। মেয়েটা মনে হয় তাকে কিছু একটা বলতে এসেছে কিন্তু কীভাবে বলবে বুঝতে পারছে না। টুনি কাজটা সহজ করার জন্য নিজেই কথা বলতে শুরু করল। জিজ্ঞেস করল, "কী খবর তোমার? তুমি কোন ক্লাসে পড়?"

মেয়েটা নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, "ক্লাস ফোর।"

মেয়েটা ঠিক চোখের দিকে তাকিয়েও কথার উত্তর দিচ্ছে না। তাকে আরেকটু সহজ করে দেওয়ার জন্য টুনি মুখটা হাসিহাসি করে বলল, "আমরা যখন ক্লাশ ফোরে পড়তাম তখন উঁচু ক্লাশের ছেলেমেয়েরা আমাদের বলতো

ক্লাশ ফোর জুতা চোর! তোমাদেরকে বলে না?"

মেয়েটা মাথা নাড়ল, "নাহ্।"

"তাহলে কী বলে?"

"কিছুই বলে না। জানেই না আমরা কোন ক্লাশে পড়ি!"

টুনি হাসার মতো ভঙ্গী করল, বলল, "সেটা হতে পারে। নিজের ক্লাশের ছাড়া অন্য কাউকে চিনে না।"

মেয়েটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু বলছেও না আবার চলেও যাচ্ছে না তাই টুনি আবার চেষ্টা করল। বলল, "তোমার নাম কী?"

মেয়েটা হঠাৎ করে মাথা তুলে দুই পাশে দেখল তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মিশু।"

টুনি বলল, "ইন্টারেস্টিং! এই নামটা ছেলেদেরও হয় মেয়েদেরও হয়। আমি একটা ছেলেকে জানি যার নাম মিশু।"

মেয়েটা হঠাৎ চাপা গলায় বলল, “আমার ক্লাশের ছেলেমেয়েরা আমাকে মিশু ডাকে না।”

“কী ডাকে?”

“মোষ।”

টুনি চমকে উঠল, “কেন?”

“আমি নাকি মোষের মতো কালো আর মোটা।” মিশু নামের মেয়েটা তার হাত দিয়ে চোখ মুছল। তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। টুনি হঠাৎ করে বুঝতে পারল মেয়েটা কেন তার কাছে এসেছে। কাজেই এক মুহূর্তে তুমি থেকে সে তুইয়ে নেমে এলো। নরম গলায় বলল, “আয়। আমার কাছে এসে বস।”

বলে তার হাত ধরে টেনে তাকে কাছে বসাল। বলল, “চোখ মুছে ফেল। তোর ক্লাশের ছেলেমেয়েরা যদি বোকা হয়, তারা যদি না জানে একটা মানুষ মোটা না চিকন, কালো না সাদা, লম্বা না বেঁটে তাতে কিছু আসে যায় না তাহলে সেটা কী তোর দোষ? তোর চোখে কেন পানি আসবে বোকা মেয়ে?”

টুনির নরম গলার স্বর শুনে মেয়েটা এবারে সত্যি সত্যি ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, “আমাদের ক্লাশের সব ছেলেমেয়ে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে, খারাপ কথা বলে– আমি আর ক্লাশে আসতে চাই না।’

টুনি মেশিনের মতো চিন্তা করতে থাকে, এরকম একটা ব্যাপার হলে কী বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায়? তার মাথায় কিছু এলো না। তাই এরকম সময়ে যা বলতে হয় তাই বলল, “মিশু, তুই এক্ষুণি কান্না বন্ধ কর না হলে আমিও কেঁদে ফেলব কিন্তু।”

মিশু চোখ মুছে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। টুনি নিচু গলায় বলল, "তুই আমার উপর ছেড়ে দে। তোদের ক্লাশের যেসব ছেলেমেয়েরা তোর সাথে এরকম ব্যবহার করে তাদের আমি টাইট করে ছেড়ে দেব। তুই আমাকে চিনিস নাই।"

মিশু নিজেকে শান্ত করে বলল, "চিনেছি আপু, সেই জন্যেই তো তোমার কাছে এসেছি। তুমি কীভাবে টাইট করবে আপু?"

টুনি কীভাবে একটা ক্লাশের সব ছেলেমেয়েকে টাইট করবে সেটা সে নিজেও জানে না, আসলেই সেটা সম্ভব কিনা সেটাও সে জানে না কিন্তু এখন সেটা নিয়ে চিন্তা না করলেও চলবে। আপাতত মেয়েটাকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে দেওয়া জরুরি। টুনি গম্ভীর গলায় বলল, "অনেকগুলো উপায় আছে, তোদের ক্লাশে কোনটা করতে হবে সেটা দেখতে হবে। তুই কি বলবি, তোর ক্লাশের ছেলেমেয়েরা কেমন করে তোর সাথে খারাপ ব্যবহার করে নাকি সেটা বলতে গিয়ে আবার কেঁদে ফেলবি?"

"মনে হয় কেঁদে ফেলব।"

"তাহলে বলার দরকার নাই। আমি জিজ্ঞেস করি তুই হুঁ হা করে উত্তর দে।"

"হুঁ হা করে?" বলে মিশু একটু হেসে ফেলল।

"হ্যাঁ, হুঁ হা করে।" টুনি জিজ্ঞেস করল, "তারা কী তোর গায়ে হাত দেয়? তোকে মারার চেষ্টা করে?"

"মাঝে মাঝে। পিছন থেকে চুল ধরে টানে। মাথার মাঝে মাথায় চাটি মারে।"

“তুই তখন কী করিস?”

“কী করব? কিছু করি না। সরে যাই। মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলি।”

টুনি হতাশভাবে মাথা নাড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করল, “তোকে কি গালাগাল করে?”

“করে। আমাকে নিয়ে কবিতা বলে।

“কী কবিতা?”

“কালা মোটা মোষ

করে ফোঁস ফোঁস।”

“তখন তুই কী করিস?”

মিশু প্রায় কেঁদেই ফেলছিল, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বলল, “কী করব? কিছু করি না। সরে যাই। মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলি।”

টুনি আবার মাথা নাড়ল, বলল, “অনেক বড় ভুল করিস। অনেক বড় ভুল। অনেক অনেক বড় ভুল!”

মিশু ভয় পাওয়া গলায় বলল, “কোনটা বড় ভুল?”

“ঐ যে তুই কেঁদে ফেলিস, সেইটা অনেক বড় ভুল। রেগে যাওয়া ঠিক আছে, কিন্তু কেঁদে যাওয়া ঠিক নাই। তুই যেহেতু কেঁদে ফেলিস তাই সবাই মজা পেয়ে গেছে। তারা তোকে কাঁদিয়ে আনন্দ পায়

“তাহলে আমি কী করব?”

“আর যাই করিস কাঁদতে পারবি না। তোর মন খারাপ হলেও কাউকে বুঝতে দিবি না যে তোর মন খারাপ হয়েছে। তাছাড়া–”

“তাছাড়া কী?”

“তাছাড়া তোর মন খারাপ হওয়ার কী আছে? তোর বন্ধুরা যদি ছাগল হয় তাহলে তোর কেন মন খারাপ হবে? তুই যখন দেখিস রাস্তায় একটা ছাগল কলার ছিলকা খাচ্ছে তোর কী তখন মন খারাপ হয়?”

মিশু মাথা নাড়ল, বলল, “না।”

“তোর একটু মায়া হতে পারে, বেচারা ছাগলটা ময়লা একটা কলার ছিলকা খাচ্ছে, ভালো কিছু খেতে পারছে না! আহা বেচারা ছাগল!”

মিশু খানিকক্ষণ চিন্তা করল, তারপর বলল, “তাহলে আমি কী করব?”

“ওদের দিকে তাকিয়ে মুখ বাঁকা করে হাসতে পারিস!”

মিশু অবাক হয়ে বলল, “হাসব?”

“নরমাল হাসি না। এবনরমাল হাসি। বাঁকা হাসি । সিনেমায় ভিলেনরা যেভাবে হাসে।

“সেটা কী রকম?”

“এই যে এই রকম–” বলে টুনি বাঁকা হাসি কীভাবে হাসতে হয় সেটা দেখিয়ে দিল। মুখের এক পাশ দিয়ে ঠোঁট দুটো একটু উপরে তুলে ভয়ংকর এক ধরনের হাসি।

মিশু কয়েকবার চেষ্টা করল এবং টুনি তাকে ঠিক করে দিতে লাগল। মিশু বেশ খানিকক্ষণ চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত কাজ চালানোর মতো একটা বাঁকা হাসি দেওয়া শিখে ফেলল। টুনি মাথা নেড়ে বলল, “বাসায় গিয়ে আয়নার সামনে প্র্যাকটিস করবি তাহলে আরো ভালো হবে। এরপর থেকে যখনই কেউ তোর সাথে খারাপ ব্যবহার করবে তুই তার দিকে তাকিয়ে এমন একটা বাঁকা হাসি দিবি যেন তার পেটের ভাত চাউল হয়ে যায়!”

‘পেটের ভাত চাউল হয়ে যায়’ কথাটা মিশুর খুব পছন্দ হলো, সে এটা শুনে হি হি করে একটু হাসল।

টুনি বলল, “ঠিক আছে, আজকে তাহলে এই পর্যন্ত। কালকে আবার আলোচনা হবে। টিফিনের ছুটিতে এখানে চলে আসবি।’

“ঠিক আছে।”

“এখনও কী তোর মন খারাপ লাগছে?”

“না আপু, মনটা অনেক ভালো হয়েছে।”

“গুড। রেগে যাওয়া ঠিক আছে, মন খারাপ করা ঠিক নাই টুনি তারপর হাত উপরে তুলে বলল, “হাই ফাইভ!”

মিশু সেই হাতে থাবা দিয়ে বলল, “হাই ফাইভ!”

.

টুনি যখনই এরকম জটিল একটা সমস্যায় পড়ে তখনই সে সেটা নিয়ে সবার সাথে কথা বলে। সাধারণত সে শুরু করে ঝুমু খালাকে দিয়ে। তার কাছ থেকে এখন পর্যন্ত ভালো কোনো সমাধান আসেনি, কিন্তু ঝুমু খালা সবসময়েই কোনো-না-কোনো সমাধান দিয়েছে। যত আজগুবিই হোক একটা সমাধান তাতে সন্দেহ নাই।

আজকেও বাসায় ফিরে ঝুমু খালাকে খুঁজে বের করল, ঝুমু খালা ছাদে টবে পানি দিচ্ছিল। টুনিকে দেখে হুংকার দিয়ে বলল, "তোমরা পাইছটা কী?"

টুনি থতমত খেয়ে বলল, "কী হয়েছে ঝুমু খালা?

"এই যে টবে এতোগুলা গাছ, কোনো টবে কোনো পানি নাই। পাতাগুলা শুকায়া দড়ি দড়ি হইছে, মাটি শুকাইয়া পাথর। গাছে যে বদদোয়া দেয় সেইটা জান? বাড়িতে গাছ লাগাইবা কিন্তু পানি দিবা না সেইটা কোন দেশি কাম?"

দোষটা যে টুনির তা নয়, কিন্তু ঝুমু খালার সাথে এসব বিষয়ে তর্ক করা খুব বিপজ্জনক। টুনি দোষটা মেনে নিয়ে বলল, "সরি ঝুমু খালা। এখন থেকে দিব। একটা রুটিন করে ফেলব কে কোনদিন পানি দেবে।"

ঝুমু খালা চোখ কপালে তুলে বলল, "গাছে পানি দিতে যদি রুটিং করতে হয় তা হইলে তো বিপদ। উপরে উইঠা যেই দেখব টব শুকনা সেই পানি দিব, তা হইলেই তো সমস্যা সমাধান!"

শব্দটা যে 'রুটিং' না, শব্দটা 'রুটিন' সেটা ঝুমু খালাকে জানানো ঠিক হবে কিনা টুনি বুঝতে পারল না। এখন যেহেতু মেজাজ গরম তাই না জানানোই ভালো। টুনি কাজের কথায় চলে এল,

বলল, “ঝুমু খালা আমি তোমার কাছে আরেকটা সমস্যা নিয়ে এসেছি, তুমি সমাধান দিতে পারবে?”

ঝুমু খালা টবে পানি দেওয়া বন্ধ করে গম্ভীর মুখে বলল, “কী সমস্যা?”

“আমাদের স্কুলে একটা মেয়ে আছে, ক্লাশের সব ছেলেমেয়ে তাকে জ্বালায়। তার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। সেইটা নিয়ে মেয়েটার মনে খুব দুঃখ। এখন এই মেয়েটা কী করবে?”

‘দোষ কার? এই মেয়ের নাকি কেলাশের ছেলেমেয়ের?’

“মেয়ের কোনো দোষ নাই। ক্লাশের ছেলেমেয়েদের দোষ আছে সেইটা কেমন করে বলব? ক্লাশ ফোরের ছোট ছেলেমেয়ে–এরা না বুঝে অনেক কিছু

করে ফেলে।

ঝুমু খালা ঠোঁট সূঁচালো করে কিছুক্ষণ চিন্তা করল তারপর বলল, “জটিল কেইস। বড় অসুখ সমাধান হতে পারে।”

টুনি অবাক হয়ে বলল, “বড় অসুখ? কার বড় অসুখ?”

“এই মেয়ের।”

“এই মেয়ের বড় অসুখ তুমি কেমন করে জান? “

“না, না, এই মেয়ের যদি বড় অসুখ হয় তাহলে সব সমস্যার সমাধান। কারো অসুখ হইলেই তার জন্য মায়া হয়, তখন আর কেউ খারাপ ব্যবহার করে না।“

“কিন্তু তার বড় অসুখ বানাবে কেমন করে?”

“অপেক্ষা কর। এসকিডেন্ট হলেও হয়। বড় এসকিডেন্ট। হাত পা ঘাড় ভেঙে গেল– “

শব্দটা ‘এসকিডেন্ট’ না শব্দটা ‘এক্সিডেন্ট’। এটাও মনে হয় এখানে বলা ঠিক হবে না। টুনি শিউরে উঠল, “না ঝুমু খালা, এক্সিডেন্টের দরকার নাই।”

“তাহলে অপেক্ষা কর। গরমের সময় ডেঙ্গু না হয় চিকুনগুনিয়া হতে পারে। সইন্ধ্যার সময় কালা কাপড় পরে বারান্দায় বসলেই মশা আইসা কামড়াইব।”

টুনি বলল, “অসুখের বুদ্ধি বাদ দাও। অন্য কোনো বুদ্ধি থাকলে বল।”

“তুমি তো আবার জরিনি বেওয়ার তাবিজে বিশ্বাস কর না, তাহলে বলতাম তার একটা তাবিজ নিতে–”

টুনি বুঝল ঝুমু খালাকে দিয়ে হবে না, তখন সে রওনা দিল ছোটাচ্চুর সাথে কথা বলতে। মাঝখানে তার টুম্পার সাথে দেখা হলো। টুম্পা ছোট মানুষ তার সাথে এরকম জটিল কথা বলে লাভ নাই তবু ভাবল একটু কথা বলে দেখা যাক। টুনি বলল, “টুম্পা তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি? “

“কর।”

“তোদের ক্লাশে কি এরকম কোনো ছেলে কিংবা মেয়ে আছে যাকে ক্লাশের কোনো ছেলেমেয়ে দেখতে পারে না?”

টুম্পা মাথা নাড়ল। বলল, “আছে।”

“আছে? সত্যি?”

“টুম্পা মাথা নাড়ল। টুনি বলল, “চিনিস তাকে তুই?”

“চিনব না কেন? আমিই তো সেই মানুষ। “

টুনি প্রায় চিৎকার করে বলল, “তোকে তোদের ক্লাশের কেউ দুই চোখে দেখতে পারে না?”

টুম্পা মাথা নাড়ল। টুনি জিজ্ঞেস করল, “তুই কেমন করে জানিস?”

“আমাকে নিয়ে কবিতা বানায়, সেইটা বলে সবাই মিলে।”

“তোকে নিয়ে কী কবিতা বানিয়েছে?”

টুম্পা মুখটা শক্ত করে বলল, “অনেকগুলা আছে। একটা হচ্ছে এরকম,

খাসি না দুম্বা
টুম্বা রে টুম্বা।”

“কবিতা মিলে নাই। তোর নাম তো টুম্বা না, তোর নাম তো টুম্পা!”

“কবিতা না মিললে কী আছে! এইটাই বলে।”

টুনি জিজ্ঞেস করল, “তখন তুই কী করিস?”

টুম্পা উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। টুনি আবার জিজ্ঞেস করল, “কী করিস?”

“সেইদিন একটা ঘুষি মেরেছি। ঠিক নাকের উপরে। ঢিসুম করে।”

“তারপরে?”

“তখন নাক ধরে ভ্যাঁ করে কেঁদে দিয়েছে।”

“তারপর?”

টুম্পা কথা না বলে ঘাড় নাড়াল।

টুনি আবার জিজ্ঞেস করল, “তারপর কী হয়েছে?” টুম্পা বলল, “ঐ তো!”

“ঐ তো মানে কী?”

“ঐ তো মানে ম্যাডামকে নালিশ দিয়েছে।”

“তারপরে? “

“তারপরে ম্যাডাম ঝাড়ি দিয়েছে।”

“শুধু তোকে না দুইজনকেই?”

“দুইজনকেই। আমাকে বেশি

“তারপর?”

“এখন কবিতা বলা কমেছে।”

টুনি মাথা নাড়ল। একটু পর জিজ্ঞেস করে, “তোকে যে সবাই মিলে জ্বালায় সেইজন্য তোর কী মন খারাপ হয়?”

“নাহ্! মন খারাপ হবে কেন?” টুম্পার মুখে বিচিত্র এক ধরনের হাসি ফুটে উঠল। বলল, “আমার মজা লাগে–সবগুলোকে আমি সাইজ করতে পারি! সবাই আমাকে ভয় পায়!”

টুনি কোনো উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ টুম্পার দিকে তাকিয়ে রইল! মিশুর সমস্যা আর টুম্পার সমস্যার এক না, ক্লাশের সবাই যদি একজনকে জ্বালায় এবং কেউ যদি সেটা থেকে মজা পায় তাহলে তার কোনো সমস্যা আছে বলে মনে হয় না, সমস্যাটা মনে হয় অন্যদের!

টুনি তারপর গেল ছোটাচ্চুর কাছে। ছোটাচ্চু বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা বই পড়ছে, বইটার নাম ‘ইউরেনিয়ামের খাঁচায় যকৃতের রস’-নিশ্চয়ই কবিতার বই, সেই জন্যে এরকম নাম। ছোটাচ্চু কবিতার বইটা পড়ে খুব আনন্দ পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। মুখ দেখে মনে হচ্ছে পেট কামড়াচ্ছে। টুনিকে দেখে ছোটাচ্চু বইটা পেটের উপর রেখে টুনির দিকে তাকাল, টুনি জিজ্ঞেস করল, “ছোটাচ্চু এই বইটা কি ডাক্তারি বই?”

ছোটাচ্চু থমথমে গলায় বলল, “এইটা জিজ্ঞেস করতে এসেছিস?”

“না না। বইটার নাম দেখে মনে হলো। অন্যকিছু জিজ্ঞেস করতে এসেছি।”

“কী জিজ্ঞেস করবি?”

“আমাদের স্কুলের ক্লাশ ফোরের একটা মেয়েকে তার ক্লাশের কেউ দেখতে পারে না। সবাই মিলে মেয়েটাকে নানাভাবে জ্বালায়, মেয়েটার খুবই মন খারাপ।“

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, “বুলিং।”

“বুলিং?”

“হ্যাঁ। এটাকে বলে বুলিং। সব জায়গাতেই আছে। অস্ট্রেলিয়ার একটা ছোট বাচ্চাকে সবাই মিলে বুলিং করেছে সেটা নিয়ে সারা পৃথিবীতে হৈচৈ হয়েছে। বাচ্চাটা খাটো ছিল, পুরো ক্লাশ সেটা নিয়ে তার সাথে টিটকারি করত।”

“বুলিং করলে কী করতে হয়?”

ছোটাচ্চু মাথা চুলকালো, বলল, “কয়দিন আগে পত্রিকায় বুলিং নিয়ে একটা লেখা ছাপা হয়েছিল, সেখানে কয়েকটা জিনিস লেখা হয়েছিল।

“কী লেখা হয়েছিল মনে আছে?”

ছোটাচ্চু বলল, “এইতো, কমন সেন্স। যাদেরকে বুলিং করে তারা

যেরকম ঝামেলায় পড়ে যারা করে তারা তার থেকে বড় ঝামেলায় পড়ে । বড় হয়ে রীতিমতো ডাকাত হয়–ড্রাগস খায়, গুন্ডামি করে।”

টুনি মাথা নাড়ল, নতুন একটা জিনিস শিখল, যারা জ্বালাতন করে

তারাও মানুষ হয় না, গুণ্ডা হয়।

টুনি এর পরে গেল শাহানা আপুর কাছে। শাহানা আপু দুই পা ছড়িয়ে দুই হাত কোমরে রেখে ডানে বামে বাঁকা হচ্ছে। টুনি জিজ্ঞেস করল, “কী কর শাহানাপু?”

“ব্যায়াম।”

“তুমি কি প্রত্যেক দিন ব্যায়াম কর?”

“মাথা খারাপ? অনেকক্ষণ বসেছিলাম তাই একটু শরীরটা নাড়াচাড়া করছি। তোর কী খবর?”

“আমার কোনো খবর নাই। কিন্তু তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে এসেছি।”

“কী জিনিস?”

“তুমি কি বুলিং কী সেটা জান?”

শাহানা তার ব্যায়াম বন্ধ করে টুনির দিকে তাকাল। বলল, “হঠাৎ করে বুলিং কী জানতে চাচ্ছিস কেন? কেউ কি কাউকে বুলিং করছে?”

“হ্যাঁ।” টুনি মাথা নাড়ল, “আমার কাছে একটা মেয়ে এসে কান্নাকাটি করেছে। তার ক্লাশের সবাই তাকে জ্বালাতন করে, টিটকারি করে

শাহানা মাথা নাড়ল, বলল, “খাঁটি বুলিং। বেচারি। কোন ক্লাশের মেয়ে?”

“ক্লাশ ফোর।”

“একটু বেশি আগে শুরু হয়েছে মনে হচ্ছে। যতদূর জানি এগারো

বারোতে শুরু হয়।

“কাউকে যদি অন্যরা বুলিং করে তাহলে তার কী করতে হয়?”

শাহানাপু বলল, “আমি কি আর জানি? যাকে বুলিং করে দেখা গেছে সে খুব নিরীহ হয়, তাকে জ্বালাতন করা সোজা! সেজন্য তাকে বেছে নেওয়া হয়। তাছাড়া–”

“তাছাড়া কী?”

“তাছাড়া সবাই তো আর বুলিং করে না এক দুইজন করে, অন্যরা হয়তো সেটা দেখেও চুপ করে থাকে।”

টুনি বলল, “ক্লাশ ফোরের বাচ্চা, কতোটুকুই আর বুঝে।”

শাহানা আপু বলল, “উল্টোটাও হতে পারে।”

“উল্টোটা কী?”

“যে বাচ্চাগুলো বুলিং করছে তাদের হয়তো নিজেদেরই সমস্যা আছে। বাসায় প্রবলেম। বাবা-মা হয়তো বাচ্চাগুলোকে মারে, অত্যাচার করে, সেটা নিয়ে নিজেদের ভেতরে রাগ অশান্তিকে বলবে?”

টুনি আরো কিছুক্ষণ কথা বলল, তারপর নিজের বাসায় গেল। মোটামুটি সবার সাথে কথা বলা হয়েছে, বাকি আছে আম্মু। তার সাথে কথা বললে শেষ হয়। তাই ঘুমানোর আগে সে আম্মুকে জিজ্ঞেস করল, “আম্মু তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি? “

“আবার কী সমস্যা? এবারে কার কী হয়েছে? কে এসেছে তোর কাছে?”

টুনি হেসে ফেলল, বলল, “তুমি কেমন করে বুঝেছ আমার কাছে কেউ এসেছে?”

“না বোঝার কী আছে! সব সময়েই তো দেখছি কেউ না কেউ কোনো না কোনো সমস্যা নিয়ে তোর কাছে আসছে।

“তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ।” টুনি তারপর আম্মুকে মিশুর ব্যাপারটার সব কিছু খুলে বলল। আম্মু সবকিছু শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, “সারা দুনিয়ায় সব সময় এই প্রবলেম। তোর এগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা না। তোদের স্কুলের টিচারদের চোখ-কান খোলা রাখা দরকার, দেখা দরকার কারো ওপর বুলিং হচ্ছে কিনা–তাদের মাথা ঘামানো দরকার।”

টুনি একটু হাসার চেষ্টা করল, বলল, “আম্মু তুমি জানো না স্কুলে কত আজব আজব টিচার আছে! আমাদের একজন টিচার আছে যে হিন্দু ছেলেমেয়েদের দেখতে পারে না, তাদেরকে নিয়ে টিটকারি দেয়, পরীক্ষায় কম নম্বর দেয়–”

আম্মু হতাশভাবে মাথা নাড়লেন। বললেন, “কবে যে সবকিছু ঠিক হবে!”

“এখন মিশুকে নিয়ে কী করব বল?”

“তুই যা করছিস ঠিকই আছে। মেয়েটার পাশে থাক। এরকম কিছু হলে বাচ্চাগুলো নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে সেটা ফিরিয়ে আনতে পারিস কিনা দেখ। যে বাচ্চাগুলো এরকম করছে টিচারদের দিয়ে তাদের একটু শাসন করাতে পারলে অনেক সময় কাজ হয়।“

টুনি আরো কিছুক্ষণ তার আম্মুর সাথে কথা বলল, তারপর শুতে গেল। শুয়ে শুয়েও সে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে সেটা দিয়ে চেষ্টা করতে পারে, দেখা যাক কাজ করে কিনা। সেটা করতে চাইলে আগে অবশ্য ছোটাচ্চুর সাথে কথা বলতে হবে। স্কুলে যাওয়ার আগে ছোটাচ্চু ঘুম থেকে উঠবে কিনা কে জানে। ছোটাচ্চু যদি না ওঠে তাহলে তাকে ঘুম থেকে তুলেই কথা বলতে হবে। ছোটাচ্চুর মনে হয় একটু মেজাজ খারাপ হবে, কিছু করার নেই।

সবকিছু চিন্তা করতে করতে টুনি এক সময় ঘুমিয়ে গেল।

.

পরদিন টিফিনের ছুটিতে টুনি স্কুলের বারান্দায় গিয়ে দেখে সেখানে মিশু বসে আছে। টুনিকে দেখে মিশু তার সবগুলো দাঁত বের করে হেসে বলল, "তুমি এসেছ?"

"হ্যাঁ। একটু দেরি হয়ে গেছে। তুই কতক্ষণ থেকে বসে আছিস?"

"অনেকক্ষণ! আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ভুলেই গেছ আমার কথা।

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "না, না ভুলব কেন? তোর জন্য একটা কাজ করতেই তো দেরি হয়ে গেল!"

"কী কাজ করেছ আমার জন্য? "

টুনির হাতে একটা প্যাকেট, সুন্দর রঙিন কাগজে মোড়ানো। সেটা মিশুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "তোর জন্য এই প্যাকেটটা বানাতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।"

মিশুর চোখ চকচক করে উঠে। জিজ্ঞেস করল, “আমার জন্য?”

“হ্যাঁ।”

“সত্যি?”

টুনি হাসল। বলল, “হ্যাঁ। সত্যি।”

মিশু খুব আগ্রহ নিয়ে প্যাকেটটা হাতে নিল, উল্টেপাল্টে দেখে বলল, “কী আছে ভিতরে?”

“খুললেই দেখবি। কিন্তু এখন খুলতে পারবি না। “

“তাহলে কখন খুলব?”

“তুই তোর ক্লাশ রুমে খুলবি, যখন স্যার ম্যাডাম নাই কিন্তু অন্য ছেলেমেয়েরা আছে তখন। যারা তোকে জ্বালায় তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে খুলবি।”

“ঠিক আছে।”

“ভিতরে একটা চিঠিও আছে। সেটা পড়বি।”

“চিঠি? কে লিখেছে?”

টুনি বলল, “কে আবার লিখবে? আমি লিখেছি।”

মিশু অবাক হয়ে বলল, “তুমি আমাকে চিঠি লিখেছ?”

“হ্যাঁ!”

“কেন? তুমি তো আমার সাথে কথাই বলতে পার।”

টুনি বলল, "কিন্তু আমি যে কথাটা বলতে চাই সেটা আমি তোকে লিখে জানাতে চাই। তুই যখন সেটা পড়বি তখন তোর ক্লাশের সবাই দেখবে, মনে হয় জানতে চাইবে চিঠিতে কী লেখা আছে–"

"হ্যাঁ। হ্যাঁ। এরা সব সময় আমার ব্যাগ খুলে দেখে, ব্যাগে কী আছে। আমার হোমওয়ার্কে যেগুলো ভুল হয় সেটা নিয়ে হাসাহাসি করে। আমি যদি চিঠি পড়ি তাহলে সবাই উঁকি দিয়ে দেখবে চিঠিতে কী লেখা আছে। সেইটা নিয়ে হাসাহাসি করবে।"

"গুড। আমিও সেইটা চাই। দরকার হলে তুই তাদের চিঠিটা পড়তেও দিতে পারিস!"

মিশু হাতের প্যাকেটটা নেড়ে চেড়ে বোঝার চেষ্টা করে ভিতরে কী আছে। মনে হচ্ছে একটা বই, কিসের বই? কে জানে।

.

মিশু সাধারণত ক্লাশের ঘণ্টা বাজার পর ক্লাশে এসে ঢুকে। তাকে দেখলেই ছেলেমেয়েরা তাকে জ্বালাতন শুরু করে দেয়, তাই যত দেরি করে সম্ভব সে ক্লাশে ফিরে আসে। আজকে সে একটু আগেই ক্লাশে ঢুকল, তাকে দেখেই ফুটফুটে একটা মেয়ে আনন্দে চিৎকার করে বলল, "এসেছে! এসেছে! মটু এসেছে!"

আরেকজন বলল, "মটু মোষ! মটু মোষ! কতো মোটা মোষ!"

ফুটফুটে মেয়েটা বলল, "দেখো, দেখো, মটু মোষের হাতে গিফট!" ছোটখাটো একটা ছেলে বলল, "কে তোমাকে গিফট দিয়েছে? কিসের গিফট? জন্মদিনের?"

ফুটফুটে মেয়েটা বলল, "জন্মদিনের না! এটা বিয়ের গিফট!"

সবাই তখন আনন্দে চিৎকার করতে থাকে, “বিয়ের গিফট! বিয়ের গিফট! মটু মোষের বিয়ে!”

মিশু সবার দিকে তাকিয়ে তার গতকালকে শেখা বাঁকা হাসিটা হেসে নিজের সিটে বসল। হাতের প্যাকেটের রঙিন কাগজটা ছিঁড়ে সে ভিতরের গিফট বের করল। খুব সুন্দর একটা নোট বই আর চমৎকার একটা কলম। মিশু কলমটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল তারপর সেটা টেবিলের উপর রেখে নোট বইটা খুলল। সেখানে ভাঁজ করা একটা কাগজ, নিশ্চয়ই টুনি আপুর চিঠি। মিশু চিঠিটা খুলল, সাথে সাথে কয়েকটা বাচ্চা চিৎকার করে উঠল, “চিঠি! চিঠি! মোষের কাছে চিঠি লিখেছে! মটু মোষের কাছে চিঠি!”

মিশু কোনো কিছুকে পাত্তা না দিয়ে চিঠি পড়তে থাকে, কয়েকজন তার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে চিঠিটা পড়তে চেষ্টা করে। মিশু চিঠিটা লুকানোর চেষ্টা করল না, টুনি আপু বলেছে সে চায় অন্যরা চিঠিটা পড়ুক! চিঠিতে লেখা :

প্রিয় মিশু

তুমি আমাকে বলেছ তোমাকে নাকি তোমাদের ক্লাশের কিছু ছেলেমেয়ে অনেক জ্বালায়। কে জানে এখনো জ্বালাচ্ছে কিনা। হয়তো তোমার ঘাড়ের উপর দিয়ে কেউ কেউ চিঠিটা পড়ছে! পড়ছে পড়ুক।

যে ছেলেমেয়েরা তোমাকে জ্বালাচ্ছে তাদের ওপর তুমি বেশি রাগ হয়ো না, কারণ এটা তাদের দোষ না। খোঁজ নিয়ে দেখো তাদের বাসায় নিশ্চয়ই সবাই তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, গালিগালাজ করে, মারধোর করে। তাই তারা মনে করে অন্যদের সাথেও বুঝি তাদের খারাপ ব্যবহার করতে হবে, গালিগালাজ করতে হবে। তারা যদি আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে না যায় তাহলে

তারা এভাবেই বড় হবে, কেউ গুন্ডা হবে, কেউ ইয়াবা খাবে, কেউ বড় হয়ে তাদের বউকে পিটাবে।

যাই হোক আমার মাথায় একটা খুব ভালো আইডিয়া এসেছে, সেই জন্য তোমাকে এই চিঠিটা লিখেছি। তোমাকে যেটা করা হয় সেটার নাম বুলিং, সারা পৃথিবীর সব জায়গাতেই বুলিং হয়। কেমন করে বুলিং করা হয় সেটা সবাই জানতে চায় সেইটা নিয়ে গবেষণা করে। তোমার ওপরে যে বুলিং করা হয় তুমি কি সেই ঘটনাগুলো লিখে রাখতে পারবে? কবে কে করেছে তাদের নামধামসহ? পারলে ছবিসহ? যদি তুমি এই রকম বেশ কয়েকটা ঘটনা লিখে রাখতে পার তাহলে সেটা বই মেলার সময় বই হিসেবে ছাপানো যাবে। তোমার বইটা হবে একজন খুব কম বয়সী বাচ্চার লেখা খুবই ইম্পরট্যান্ট একটা বই। সবাই এইটা পড়ে দেখতে চাইবে।

তোমার মনে হতে পারে, তুমি এতো ছোট তাই কেউ তোমার বই ছাপাবে না। এই ব্যাপারে আমি আমার ছোট চাচা বিখ্যাত ডিটেকটিভ শাহরিয়ারের সাথে কথা বলেছি। তিনি আমাকে বলেছেন যে তিনি বইটি ছাপানোর ব্যবস্থা করে দেবেন। শুধু তাই না, বিখ্যাত গায়ক মাহী কাঞ্চনকে দিয়ে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করিয়ে দেবেন।

সেজন্য আমি তোমাকে এই ডাইরি এবং কলমটি দিয়েছি। তোমার সাথে যারা খারাপ ব্যবহার করছে তুমি তাদের নাম রোল নম্বরসহ ঘটনাটি সুন্দর করে গুছিয়ে লিখে ফেল। এখন থেকে যখনই কেউ তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে, তোমাকে গালাগাল দেবে তুমি সাথে সাথে সেটা তোমার ডাইরিতে লিখে ফেলবে। সবসময় ডাইরিটা নিজের কাছে রাখবে। কেউ গালাগাল দিলে কিংবা খারাপ ব্যবহার করলে তুমি এখন থেকে আর মন

খারাপ করবে না। সেটা লিখ এবং সেটা থেকে একটা বই প্রকাশিত হবে।

বইটির কী নাম দেওয়া যায় এবং কে এর প্রচ্ছদ আঁকবে সেটা পরে ঠিক করব। আমাদের হেড মিস্ট্রেসের সাথে আমার খাতির আছে। আমি তাকে অনুরোধ করলে তিনি নিশ্চয়ই একটা ভূমিকা লিখে দেবেন।

আমার সাথে যোগাযোগ রেখো।

টুনি, সপ্তম শ্রেণী।

চিঠি পড়া শেষ করে মিশু পিছন দিকে তাকালো, বেশ কয়েকজন শুকনো মুখে তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মনে হয় পুরোটা পড়া হয় নাই। মিশু জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কী চিঠিটা পড়তে চাও?"

ছেলেমেয়েগুলো একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালো। ফুটফুটে মেয়েটা দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল। মিশু চিঠিটা তার হাতে দিয়ে বলল, "পড়া শেষ হলে আমাকে দিয়ে দিও, প্লিজ।"

পড়া শেষ হতে অনেকক্ষণ লাগল, কারণ ফুটফুটে মেয়েটা পড়া শেষ হওয়ার পর, খাটো ছেলেটা পড়ল, খাটো ছেলেটার পর চশমা পরা ছেলেটা পড়ল, চশমা পরা ছেলেটার পর, ন্যাড়া মাথা ছেলেটা পড়ল, ন্যাড়া মাথার পর আরেকজন, তারপর আরেকজন এভাবে সবাই পড়তে লাগল।

মিশু এর আগে নিজে থেকে কারো সাথে কথা বলেনি, আজকে বলল! ফুটফুটে মেয়েটাকে বলল, "তোমার একটা ছবি আমাকে দেবে প্লিজ?"

মেয়েটা বলল, “ছবি? অ্যাঁ ছবি? আ-আ-আমার ছবি?”

“না দিলেও ঠিক আছে। আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনে তুমি ‘সবার জন্যে ভালোবাসা’ নিয়ে একটা খুব সুন্দর কবিতা লিখেছিলে না? সেইখানে তোমার একটা সুন্দর ছবি ছিল। সেই ছবিটা কেটে নিব।”

ফুটফুটে মেয়েটা কিছু একটা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলতে পারল না।

সপ্তাহ খানেক পরের কথা। টুনি স্কুলের বারান্দায় বসে মাঠে সবাইকে ছোটাছুটি করতে দেখছে, তাকে কয়েকবার ডেকে গেছে, সেও মাঠে যাবে কিনা চিন্তা করছে। ঠিক তখন মিশু এসে হাজির হলো। সে একা নয় তার সাথে একটি ফুটফুটে মেয়ে।

টুনি জিজ্ঞেস করল, “কী রে মিশু, তোর বই লেখার কতদূর?”

মিশু মাথা চুলকে বলল, “সেটা নিয়েই কথা বলতে এসেছি।”

“কী কথা, বলে ফেল।”

“মনে হয় বই লেখা হবে না।”

টুনি বলল, “লেখা হবে না? সে কী? আমি ছোটাচ্চুকে বলে রেখেছি, পাবলিশার রেডি।”

মিশুর পাশে দাঁড়ানো ফুটফুটে মেয়েটি বলল, “আমরা মিশুকে অন্য কিছু নিয়ে লিখতে বলেছি। যেমন মনে করো ভূতের গল্প।“

টুনি জিজ্ঞেস করল, “তুমি কে? চিনতে পারলাম না তো?”

“আমি মিশুর বন্ধু। একসাথে পড়ি।”

“ও!”

মিশু জিজ্ঞেস করল, “ভূতের গল্প কী হবে? না হলে ডিটেকটিভ?”
ফুটফুটে মেয়েটি বলল, “আমরা দুইজনে মিলে কবিতাও লিখতে পারি।”

মিশু বলল, “শোয়েব বলেছে সে ছবি এঁকে দেবে। খুব সুন্দর ছবি আঁকে।”

টুনি জানতে চাইল, “শোয়েব কে?”

ফুটফুটে মেয়েটি বলল, “আমাদের ক্লাশের আরেকজন ছেলে ঐ যে চোখে চশমা—”

টুনি বলল, “ও! আচ্ছা।”

মিশু বলল, “অন্য কিছু নিয়ে কী লেখব আমরা?”

“ঠিক আছে। লিখতে থাকো। দেখি কেমন হয়।”

মিশু আর ফুটফুটে মেয়েটি উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে চলে গেল।

টুনি সেদিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল। নিশানা ভালো।

৪. কাচু কবিরাজ

দাদির (কিংবা নানির) ঘরে ঢুকেই টুনি ঝট করে ঘুরে বের হয়ে আসতে চাইছিল কিন্তু পারল না। দাদি বললেন, "এই টুনি! শুনে যা।"

টুনিকে বাধ্য হয়ে ঢুকতে হলো। টুনি যে কারণে বের হতে চাইছিল সেই মানুষটি একটি চেয়ারে একটা পা তুলে বসে আছে। থুতনিতে ছাগল দাড়ি, গলায় মাফলার প্যাচানো। মুখে পান, সেটা বিপজ্জনকভাবে চিবিয়ে যাচ্ছে, পাশে একটা স্যুটকেস। টুনি শেষবার কবে এরকম স্যুটকেস দেখেছে মনে করতে পারে না। স্যুটকেসের পাশে দুইটা মুরগি, পা বাঁধা মুরগি দুটো উল্টো হয়ে ঝুলে আছে। এর মধ্যে যদি দাদির ঘরে বাথরুম করে না থাকে যে কোনো সময় করে ফেলবে।

গ্রাম থেকে দাদির কাছে প্রায়ই এরকম মানুষ আসে। কেউ চিকিৎসার জন্য আসে, কেউ মামলার জন্য, কেউ মোবাইল ফোন কেনার জন্য। একবার একজন এসেছিল চিড়িয়াখানা দেখার জন্য। দাদির (কিংবা নানির) অসীম ধৈর্য্য, যে যেটা করতে চায় কীভাবে কীভাবে জানি সেটা করিয়ে ফেলেন!

এই মানুষটার স্যুটকেস দেখে বোঝা যাচ্ছে কিছুদিন থাকার জন্য এসেছে। মুরগি দুটো দেখে বোঝা যাচ্ছে খালি হাতে আসা ভালো দেখায় না বলে মানুষটি এই মুরগিগুলো এনেছে।

দাদি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই মানুষটা বলল, "এইডা কেডা? শাহানা? ইয়া মাবুদ, বড় হয় নাই দেখি। চিমসে লাইগা আছে? মাছ গোশত খায় না?"

টুনি আপত্তি করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলল না। এই মানুষটাকে কিছু বলার মনে হয় কোনো মানে হয় না।

দাদি বললেন, “না, না। এইটা শাহানা না। শাহানা তো আমার সবচেয়ে বড় নাতনি। এ অনেক ছোট।”

মানুষটা মুখটা একটু উপরে তুলে বলল, “নাম কী? বয়স কত?”

মুখটা উপরে তুলে রাখার জন্য পানের পিকটা মুখ থেকে বের হয়ে তার থুতনি, দাড়ি কিংবা গলার মাফলারে মাখামাখি হয়ে গেল না। মুখের ভেতরে সেটা ছলাৎ ছলাৎ করতে লাগল।

টুনি উত্তর দেওয়ার আগেই দাদি বললেন, “আমরা টুনি বলে ডাকি মনে হয় তেরো বছর বয়স হলো। তাই না রে টুনি?”

টুনি মাথা নাড়ল। মানুষটা পানের পিকটা রক্ষা করে মুখের পানটা কয়েকবার চিবিয়ে নিয়ে বলল, “ইয়া মাবুদ! তেরো বছর তো বালেগা। বিয়ার বয়স। আমার মেয়ের বিয়া দিছি।”

বালেগা শব্দের অর্থ টুনি জানে না, কিন্তু মনে হলো শব্দটা বড় হওয়া বোঝায়। শব্দটার ব্যবহারটা টুনির মোটেও পছন্দ হলো না। টুনি এই প্রথম কথা বলল, “আঠারো বছরের আগে বিয়ে দেওয়া বেআইনি। আপনাকে পুলিশের ধরে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। নেয় নাই?”

মানুষটা থতমত খেয়ে গেল। মনে হয় টুনির কথায় অবাক হয়ে একটা বিষম খেল এবং টুনি যে আশংকা করেছিল সেটাই ঘটে গেল, পানের পিক মুখ থেকে বের হয়ে দাড়ি বেয়ে গলায় মাফলার পর্যন্ত চলে এলো। দেখে টুনির মনে হলো সে বমি করে দিবে।

মানুষটা অবশ্য মোটেও বিচলিত হলো না। টুনি এবারে গলার মাফলারের গুরুত্বটা বুঝতে পারল। মানুষটা মাফলারের মাথাটা

দিয়ে পানের পিকটা মুখে ফেলার চেষ্টা করতে থাকল। টুনির মনে হলো মাফলারটা অন্য রংয়ের ছিল এই খয়েরি রংটা নিশ্চয়ই পানের পিকের কারণে হয়েছে।

টুনি এবারে দাদির দিকে তাকিয়ে বলল, "দাদি, আমাকে কেন ডেকেছ?"

"যা দেখি, ঝুমুকে ডেকে আন।"

মানুষটা শেষ পর্যন্ত তার পানের পিকটা সামলে নিয়েছে, টুনির দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু টুনি তাকে কোনো সুযোগ দিল না, শুট করে বের হয়ে গেল। বের হওয়ার সময় শুনতে পেল আজকালকার ছেলেমেয়েদের আদর-লেহাজের কত সমস্যা সেইটা নিয়ে মানুষটা কিছু একটা বলছে। টুনি মোটেও পাত্তা দিল না। এই রকম মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই।

ঝুমু খালাকে স্টোর রুমে পাওয়া গেল। সেখানকার নানা ধরনের টিন এবং কৌটা খুলে খুলে কিছু একটা দেখছে। টুনিকে দেখে বলল, "এই বাড়িতে কোনো শৃঙ্খলা নাই। দেখে মনে হয়, পাগলের বাড়ি

টুনি বলল, "শৃঙ্খলা আনার জন্যই তো তুমি আছ।"

"শৃঙ্খলা এনে লাভ নাই।"

"কেন ঝুমু খালা?

"তাহলে কেউ টিকতে পারবে না। শৃঙ্খলা নাই বলে টিকে আছে।" তারপর কৌটাগুলো খুলে ভেতরে তাকাতে লাগল এবং

হতাশভাবে মাথা নাড়তে লাগল। কিসের জন্য এই হতাশা টুনি আন্দাজ করার চেষ্টা করল কিন্তু অনুমান করতে পারল না।

টুনি বলল, “ঝুমু খালা, দাদি তোমাকে ডাকে।”

“সিরিয়াল শুরু হইছে?”

“সিরিয়াল দেখার জন্য না, মনে হয় অন্য কাজ আছে।

“কী কাজ?”

“গ্রাম থেকে গেস্ট এসেছে, মনে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।“

ঝুমু খালা ভুরু কুঁচকে বলল, “কোন পদের গেস্ট? সাদাসিদা নাকি পিছলা?”

টুনি বলল, “মনে হয় পিছলা। দুইটা মুরগি নিয়ে এনেছে।”

“মুরগি?”

“হ্যাঁ।”

ঝুমু খালা তার হাতের কৌটার ভেতরে একবার শুঁকে রেখে দিয়ে বলল, “বুঝছি। কেস জটিল। চল। যাই।”

“আমি যাব না।”

“কেন?”

“তুমি যাও, তাহলে নিজেই বুঝতে পারবে।”

ঝুমু নিজের বুকে থাবা দিয়ে বলল, “তোমার কুনু ভয় নাই। আস আমার সাথে।” বলে গটগট কর রওনা দিল। যেতে যেতে টুম্পাকেও পেয়ে গেল, তাকেও সাথে নিয়ে নিল।

দাদির ঘরে ঢুকে ঝুমু খালা মানুষটার দিকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে দাদিকে জিজ্ঞেস করল, “খালা, আমারে ডাকছেন?”

দাদি (কিংবা নানি) বললেন, “হ্যাঁ ঝুমু। আমাদের গ্রাম থেকে একজন গেস্ট এসেছে, তার থাকার ব্যবস্থা করে দাও। গেস্ট রুমটা খুলে একটু গোছগাছ করে দিও।”

ঝুমু খালা এবারে এমন ভান করল যে প্রথমবার মানুষটাকে দেখেছে। এক নজর দেখেই সে নাক-মুখ কুঁচকে ফেলল, মুরগি দুইটার দিকে তাকিয়ে রীতিমতো হুংকার দিয়ে বলল, “এই গুলান কী? “

মানুষটা তার চিবানো বন্ধ করে পানের পিক রক্ষা করে চিঁ চিঁ করে বলল, “মুরগি।”

“সেইটা তো দেখছি। আনছেন কেন?”

“ভাবলাম খালার জন্য নিয়ে যাই। গ্রামের ফ্রেশ মুরগি।”

ঝুমু খালা নিচু হয়ে মুরগি দুটোর পা ধরে টান দিয়ে উপরে তুলে চোখের সামনে ধরে রেখে মুখটা বিকৃত করে ফেলল। বলল, “ইয়া মাবুদ। এইগুলা কী মুরগি আনছেন?”

মানুষটা থতমত খেয়ে খেয়ে জিজ্ঞেস করল, “কেন?”

“দেখছেন না এইগুলো বুড়া মুরগি? এই বুড়া মুরগি কে খাবে? এই বাসায় আমরা কচি মুরগি খাই। এই মুরগি কেউ ছুবে না।”

নিজের কথা সত্যি প্রমাণ করার জন্য ঝুমু খালা টুনি আর টুম্পার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তাই না?"

টুনি আর টুম্পা কী বলবে বুঝতে না পেরে মাথা নাড়ল। দাদি তখন একটু আপত্তি করার চেষ্টা করলেন। বললেন, "এগুলো তুমি কী বলছ ঝুমু। মানুষটা আমার জন্য গ্রাম থেকে দুইটা মুরগি এনেছে–"

ঝুমু খালা দাদিকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিল, "না না–খালা আমি সবার জন্য রান্ধি–এই বাড়িতে কে কী খায় আমি জানি। এই বুড়া মুরগির ঠ্যাং কেউ ছুঁইয়াও দেখব না।" তারপর মানুষটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি গ্রামে যাবার সময় ফেরত নিয়ে যাবেন। এখন আমি আপনার ঘরে খাটের নিচে রেখে দিব। নেন, উঠেন–"

এবারে দাদি ঝুমু খালাকে একটা ধমক দিয়ে বললেন, "কী আবোল তাবোল বলছ। খাটের নিচে মুরগি রেখে দিবে মানে? যাও–রান্না ঘরে নিয়ে যাও।"

ঝুমু হলে ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গী করে বলল, "আপনি বললে তো নিতেই হবে। কিন্তুক খালাম্মা পরে আমারে দুষ দিয়েন না। এর গুশত সিদ্ধ না হইলে কিন্তুক আমার দুষ নাই–"

দাদি বললেন, "সে দেখা যাবে।" তারপর মানুষটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাহলে ঠিক আছে কাচু কবিরাজ, তুমি বিশ্রাম নেও। সকালে কথা হবে।"

ঝুমু খালা এইবারে চোখ বড় বড় করে ফেলল, "আপনি কবিরাজ? কবিরাজি চিকিৎসা করেন?"

মানুষটা ঝুমু খালাকে একটু একটু ভয় পেতে শুরু করেছে। পান চিবানো বন্ধ করে মাথা নাড়ল। ঝুমু খালা জিজ্ঞেস করল, "আপনি কিসের কবিরাজি করেন?"

"এইতো রোগ শোকের। নানারকম ব্যারামের—"

"জীন ভূতে পাওয়া মানুষ? সাপে কাটা? মৃগী ব্যারাম?"

মানুষটা দুর্বলভাবে হাসল, বলল, "এইতো–" কিন্তু পরিষ্কার উত্তর দিল না।

ঝুমু খালার মুখে এবারে হাসি ফুটে উঠল। মাথা নেড়ে বলল, "ভালো হইছে একটা কবিরাজ পাইছি! আমার সব সমস্যার চিকিৎসা করতে পারবেন।"

টুনি বলল, "তোমার আবার কী সমস্যা ঝুমু খালা?"

"সমস্যার কী অভাব আছে? মাঝে মাঝে কোমরে টাশ মারে। রগে টান

পড়ে। মাথার সব চুল উঠে টাক পড়ে পড়ে অবস্থা–"

টুম্পা হি হি করে হাসল, বলল, "তোমার মোটেও চুল পড়ে নাই ঝুমু খালা! তোমার মাথায় কত চুল!"

টুনি জিজ্ঞেস করল, "কোমরে টাশ কেমন করে মারে?"

"আমারে জিজ্ঞেস করে কী হবে, কবিরাজ চাচারে জিজ্ঞেস কর।"

টুনি কবিরাজ চাচাকে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না। ঝুমু খালা তখন দুই মুরগি হাতে নিয়ে বের হয়ে গেল। তার পিছু পিছু

টুনি আর টুম্পা। সবার পিছনে স্যুটকেস হাতে কাচু কবিরাজ। ঝুমু খালার সাথে সাক্ষাতের পর তার তেজ অনেকটুকু কমে গেছে।

.

দাদির কাছে অনেকেই আসে, এই বাসার বাচ্চা কাচ্চারা তার খবর রাখে না। কিন্তু এই কাচু কবিরাজের কথা বাচ্চারা সবাই বেশ ভালোভাবে টের পেল। তার এক নম্বর কারণ রাতের বেলা পড়ালেখা শেষে (কিংবা পড়ালেখার ভান শেষে) সবাই যখন দাদির ঘরে একত্র হয় হৈ চৈ চেঁচামেচি করে তখন কাচু কবিরাজও সেখানে এসে বসে থাকে। শুধু সে বসে তাকে তা নয়, তাদের কথাবার্তার মাঝে নাক গলায়, তাদের আদব লেহাজ শেখানোর চেষ্টা করে। আজকেও সেটা ঘটছে। সবাই মিলে দাবা খেলছে, দাবার থেকে একাগ্র মনে খেলার মতো অন্য কোনো খেলা পৃথিবীতে নেই। কিন্তু এখানে তার সম্পূর্ণ বিপরীত, তুমুল হট্টগোল চলছে। তার কারণ দাবার বোর্ডে পরিচিত রাজা মন্ত্রী ঘোড়া এসব ছাড়াও নতুন গুটি বসানো হয়েছে সেগুলো হচ্ছে জেনারেল, শিক্ষামন্ত্রী এবং স্পাই। দুইজন সন্ত্রাসীও আছে তারা খেলার মাঝখানে কখন কী করে ফেলে তার ঠিক নেই। আট ঘরের দাবার বোর্ডে সবাইকে আঁটানো যাচ্ছে না বলে পাশাপাশি দুইটা বোর্ড রেখে বোর্ডের সাইজ বাড়ানো হয়েছে। খেলার মাঝে তুমুল উত্তেজনা এবং চেঁচামেচি। একটা সন্ত্রাসী গুটি বিপক্ষ দলের রাজাকে ড্রোন দিয়ে আক্রমণ করে মেরে ফেলার পরে চেঁচামেচি অনেক বেড়ে গেল তখন চু কবিরাজ হতাশভাবে মাথা নেড়ে দাদিকে (কিংবা নানিকে) বলল, “আপনার বাড়িতে পুলাপান ঠিক করে মানুষ হয় নাই। “

বাচ্চাগুলো কাচু কবিরাজের কথা শুনে আরো উত্তেজিত হয়ে দাদিকে বলল, “ঠিক কথা! একেবারে ঠিক কথা! দাদি, তুমি কী রকম দাদি হয়েছ যে নাতিদের মানুষ করতে পার নাই?”

আরেকজন বলল, “ছেলে পিলে নষ্ট করার জন্য তোমার বিরুদ্ধে মামলা করে দেওয়া দরকার!”

আরেকজন বলল, “মেয়েদের এতো বয়স হলো, এখনও বিয়ে দাও নাই! ছিঃ ছিঃ দাদি। ছিঃ ছিঃ নানি!”

শান্ত বলল, “ছেলেদেরও বিয়ে দিতে পার দাদি, আমাদের কোনো আপত্তি নাই।”

তখন সবাই আনন্দে হি হি করে হাসতে হাসতে বলল, “শান্ত ভাইয়াকেই সবার আগে বিয়ে দিয়ে দাও।” তারপর সবাই মিলে শান্তকে ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে।

কাচু কবিরাজের কথাটাকে নিয়ে সবাই এতো হাসি তামাশা করছে দেখে সে মুখটা কালো করে ফেলল। তারপর বলল, “পুলাপান কন্ট্রোল করার তাবিজ আছে। এই পুলাপানদের তাবিজ দেওয়া দরকার। অনেক সময় জীন- ভূতের আছর থাকলে পুলাপান এই রকম হয়।”

কাচু কবিরাজের কথা শুনে একসাথে সবাই লাফিয়ে উঠল। আনন্দে চিৎকার করে বলল, “তাবিজ! তাবিজ!” তারপর কাচু কবিরাকে ঘিরে হাত পেতে চিৎকার করতে লাগল, “দেন! দেন! তাবিজ দেন! আমাকে একটা কবিরাজি তাবিজ দেন!”

ছোট-বড় সবাই হাত পেতে বলতে লাগল, “আমাকে একটা! আমাকে একটা!”

শুধু শান্ত বলল, “আমাকে দশটা! আমাকে দশটা!”

টুনি জানতে চাইল, “তুমি দশটা দিয়ে কী করবে?”

“হাতে পায়ে কোমরে, গলায় সব জায়গায় একটা করে লাগবে। দশ গুণ একশান!”

প্রমি বলল, “আমারটা হবে ডিজাইনার তাবিজ!”

তখন অন্যরাও বলতে লাগল, “আমারটাও! আমারটাও!”

শান্ত জানতে চাইল, “কবিরাজ চাচা। এই তাবিজ বিছানায় পিশাব বন্ধ করবে তো?”

সবাই থেমে গিয়ে এবারে শান্তর দিকে তাকাল। একজন সাহস করে জিজ্ঞেস করল, “বিছানায় পেশাব? তুমি কী এখনও বিছানায় পেশাব কর?”

শান্ত দাঁত বের করে হেসে বলল, “করি না। কিন্তু যদি ডাবল একশন তাবিজ থাকে তাহলে চেষ্টা করে দেখব কী হয়!”

সবাই মুখ বিকৃত করে বলতে থাকল, “শান্ত ভাইয়া, তুমি এতো নোংরা কথা বলতে পার! ছিঃ! ছিঃ!”

দাদি বললেন, “ছিঃ শান্ত! তুই সব সময় আজেবাজে কথা বলিস।”

কিন্তু শান্তর কথাটাতে কাজ হলো। কাচু কবিরাজ মুখ কালো করে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। বাচ্চারা আনন্দে চিৎকার করে তাদের ভয়ংকর দাবা খেলায় ফিরে গেল!

.

টুনি অবশ্য কাচু কবিরাজের অন্য একটা বিষয় নিয়ে খুবই কৌতূহলী হলো, মানুষটা এখানে এসে কী করছে? সকাল বেলা বের হয়ে যায়, সারাদিন শেষে সন্ধেবেলার দিকে নানা রকম পোটলা নিয়ে ফেরত আসে। তার ভিতরে কী আছে সেটা বোঝা যায় না। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে। তারপর যখনই বের হয় ঘরে একটা তালা লাগিয়ে রাখে। এই বাসায় কেউ কখনো কারো রুমে তালা লাগাতে দেখেছে বলে টুনি মনে করতে পারে না। রহস্যের সেখানেই শেষ না, গভীর রাত পর্যন্ত কাচু কবিরাজের ঘর থেকে ঠুকঠুক শব্দ শোনা যায়। সে কী করে কে বলতে পারবে?

একদিন শুধু কাচু কবিরাজ ঝুমু খালাকে জিজ্ঞেস করেছে তার কাছে কোনো খালি কৌটা আছে কি না। এই বাসায় খালি কৌটার কোনো অভাব নেই তাই ঝুমু খালা তাকে অনেকগুলো খালি কৌটা দিয়েছে সেখান থেকে বেছে বেছে বড় কয়েকটা কৌটা নিয়েছে। এই কৌটায় কোনো একটা জিনিস রাখা হবে। কী রাখা হবে সেটাই টুনি জানতে চায়।

কাচু কবিরাজ যেহেতু একজন কবিরাজ তাই তার কবিরাজি জিনিসপত্র তৈরি করার জন্য মালমসলা কিনতেই পারে, কৌটায় ভরে সেগুলো নিতেই পারে কিন্তু এরকম গোপন রাখার অর্থ কী? কেউ যদি কিছু গোপন রাখার চেষ্টা করে তাহলে প্রথমেই মনে হয় কোনো একটা বেআইনি কাজ করছে কিংবা অন্যায় কাজ করছে। তাহলে কি কাচু কবিরাজও অন্যায় কাজ করছে? যদি করে থাকে তাহলে সেটা কী হতে পারে? টুনি চিন্তা করে পায় না।

সবচেয়ে সোজা হতো যদি ছোটাচ্চুর গোপন ভিডিও ক্যামেরাটা ঘরে রেখে দেওয়া যেতো। কিন্তু ডিটেকটিভ কাজ ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে সেই ভিডিও ক্যামেরার কোনো খোঁজ নেই। আরো

একটা উপায় হচ্ছে মানুষটার পিছু পিছু গিয়ে দেখা সে সারাদিন কী করে, কোথায় যায়। কিন্তু টুনির পক্ষে সেটা কঠিন কাজ! ছোটাচ্চু চাইলে করতে পারতো কিন্তু ছোটাচ্চু এই কবিরাজ নিয়ে কেন মাথা ঘামাবে?

তাই টুনি নিজেই সাধারণ কাজগুলো করছে। এই ঘর থেকে ময়লা ফেলার ঝুড়িটা কোনোভাবে বের করা যায় কিনা সেটা চেষ্টা করে দেখছে। সেখানে সাধারণত অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষটা মনে হচ্ছে সেটাও বের করছে না। বাড়ী চলে যাবার পর ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হলে মনে হয় কিছু অনুমান করা যাবে।

আপাতত টুনি কাচু কবিরাজকে চোখে চোখে রাখছে। সে কি করে না করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ঘরটাতে একবার কিছুক্ষণের জন্য ঢুকতে পারলেই কাজ হয়ে যাবে, টুনি শেষ পর্যন্ত সেটাই করার জন্য একটা বুদ্ধি বের করল।

প্রথমে কয়েকটা কাঁচের টুকরা জোগাড় করল। কাজটা খুব সহজ হলো না; একটা পুরানো লাইট বাল্ব একটা পলিথিনের ব্যাগের ভিতর রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সেটাকে ভাঙল। সেখান থেকে পাতলা পাতলা কয়েকটা টুকরো নিয়ে কাচু কবিরাজের ঘরে গেল। কাচু কবিরাজ বাইরে গেছে, তার ঘরের দরজা বন্ধ, সেখান বিশাল একটা তালা ঝুলছে দরজার নিচে শুধুমাত্র একটুখানি ফাঁক। টুনি সেই ফাঁক দিয়ে পাতলা পাতলা কাঁচের টুকরোগুলো ঠোকা দিয়ে ভিতরে পাঠিয়ে দিল।

তারপর গেল ঝুমু খালার কাছে। মুখ কাচুমাচু করে বলল, “ঝুমু খালা-”

ঝুমু খালা চোখ পাকিয়ে বলল, “এখন কী হইছে?”

“আমার একটা সায়েন্স প্রজেক্টের জন্য একটা লাইট বাল্বের দরকার ছিল।”

“সেইটা দরকার?”

“না। আমি একটা বাল্ব পেয়েছি, নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন–”

“তখন কী?”

“তখন হঠাৎ হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল।”

ঝুমু খালা হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, “একটা লাইট বল হাত দিয়ে ধরে রাখতে পার না?”

“লাইট বল না, লাইট বাল্ব –“

ঝুমু খালা ধমক দিয়ে বলল, “একই কথা–”

“আমি ধরেই রেখেছিলাম তারপরেও কীভাবে জানি পড়ে গেল।”

“এখন?”

“পড়ে ভেঙে গিয়ে কাঁচের টুকরা সব দিকে ছড়িয়ে গেছে–”

ঝুমু খালা হুংকার দিয়ে বলল, “সেই কাঁচে পা দিয়া পা কাটছ?” ঝুমু খালা উবু হয়ে টুনির পায়ের দিকে তাকাল।

“না, না, পা কাটে নাই।”

“তাহলে?“

“আমি ঝাড়ু দিয়ে সব পরিষ্কার করে ফেলেছি।”

“আমারে ডাক দিলা না কেন? মাতবরি করার দরকার কী ছিল? এর পরে আমারে বলবা।”

“ঠিক আছে। কিন্তু–”

“কিন্তু কী? “

টুনি মাথা চুলকে বলল, “লাইট বাল্বটা ভেঙেছে ঠিক গেস্ট রুমের সামনে–যেখানে কবিরাজ চাচা আছে।”

“তয়?”

“মনে হয় কয়টা কাঁচের টুকরা দরজায় তলা দিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেছে। এখন–”

“এখন কী?”

“কবিরাজ চাচা আসার পরে যদি খালি পায়ে হেঁটে–”

“ঘর ঝাড়ু দিতে হবে।” ঝুমু খালা মাথা নাড়ল।

“দরজায় এতো বড় তালা, ঝাড়ু দিবে কেমন করে?”

ঝুমু খালা ভুরু কুঁচকে বলল, “এই কবিরাজ কী করে ঘরের ভিতর? দরজায় তালা মারে কেন?”

“সেইটা জানি না। যখন কবিরাজ চাচা আসবে তখন তুমি কি একটু

ঘরটা ঝাড়ু দিতে পারবে?”

“ঠিক আছে। কোন সময় আসবে সেইটাও তো জানি না।“

“আমি তোমাকে বলে দেব।“

“ঠিক আছে।”

টুনি মুখটা গম্ভীর করে বের হয়ে এলো। কবিরাজ চাচার ঘরে ঢোকায় একটা ব্যবস্থা করা হলো। আর যাকেই আটকানো যাক না কেন, ঝাড়ু হাতে ঝুমু খালাকে দুনিয়ার কেউ আটকাতে পারবে না। ঝুমু খালা এই ঘরে ঢুকবেই! তখন কোনো একটা কায়দা করে সেও ঢুকে যাবে!

কাচু কবিরাজ সন্ধেবেলা দুই হাতে অনেক বড় বড় দুইটা কাগজের প্যাকেট নিয়ে ফিরে এলো। টুনি চোখ খোলা রেখেছিল এবং ফেরার সাথে সাথে সেটা ঝুমু খালাকে জানিয়ে এলো। ঝুমু খালাও দেরি করল না, একটা ঝাড়ু নিয়ে কাচু কবিরাজের ঘরে হাজির হলো। কাচু কবিরাজ তার বিশাল তালা খুলে ঘরে ঢুকে হাতের প্যাকেটগুলো নিচে রেখে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই ঝুমু খালা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেছে। টুনি বাইরে থেকে শুনল, ঝুমু খালা বলছে, “কবিরাজ সাহেব, যেখানে আছেন সেইখানে খাড়াইয়া থাকেন। এক পাও নড়বেন না।”

কাচু কবিরাজ অবাক হয়ে বলল, “কেন?”

“ঘরে ভাঙা কাঁচ, নড়লেই পায়ে লাগব।“

কাচু কবিরাজ বলল, “আমার পায়ে জুতা, সমস্যা নাই।”

“আপনার সমস্যা নাই কিন্তুক আমার আছে। আপনার জুতা দিয়ে কাঁচের টুকরা সারা বাসায় ছড়াইব। এই বাসায় পুলাপান খালি পায়ে দৌড়াদৌড়ি করে। তাদের পা কাটব।”

কাচু কবিরাজ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঝুমু খালা সুযোগ দিল না। বলল, "দুই পা সামনে গিয়া দাঁড়ান, আমি কাঁচের টুকরাগুলো দেখছি। ঝাড়ু দিয়া সরাইয়া নেই।"

কাচু কবিরাজ নিশ্চয়ই দুই পা সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ঝুমু খালা মাত্র ঝাড়ু দেওয়া শুরু করেছে তখন টুনি খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল এবং তাকে দেখে কাচু কবিরাজ কেমন যেন আঁতকে উঠল। টুনি এমন ভান করল যেন সে কাচু কবিরাজকে দেখেইনি। ঝুমু খালাকে বলল, "ঝুমু খালা তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম।"

ঝুমু খালা ঝাড়ু দেওয়া বন্ধ করে চোখ কটমট করে টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, "সাবধান! কাছে আইস না। ঘর ভর্তি ভাঙা কাঁচ।"

"একটা জিনিস জিজ্ঞেস করে চলে যাব।" টুনি কথা বলার সময় সোজাসুজি তাকাল না, চোখের কোণা দিয়ে ঘরটা দেখতে লাগল। ঘরময় ছড়ানো ট্যাবলেটের পাতা, ট্যাবলেটগুলো বের করে খালি পাতাগুলো মেঝেতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। টেবিলে একটা হামান দিস্তা, তার পাশে কয়েকটা কৌটা। সেখানে নানা রকম পাউডার, মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই ট্যাবলেটের গুড়ো।

ঝুমু খালা বলল, "কী জিজ্ঞেস করবা?"

"ডিম সিদ্ধ করতে কতক্ষণ লাগে?"

"হাফ বয়েল না ফুল বয়েল?"

ডিম সিদ্ধ করারও যে হাফ বয়েল ফুল বয়েল আছে টুনি জানতো না। ইতঃস্তত করে বলল, "মনে কর হাফ বয়েল।"

“ডিম কী ফিরিজ থেকে বের করছ না বাইরে আছে?”

টুনি দেখল কাচু কবিরাজ তার কৌটাগুলো চোখের আড়াল করার চেষ্টা করছে। হামান দিস্তাটাও একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলল। ট্যাবলেটের খালি পাতাগুলো পা দিয়ে ঠেলে বিছানার নিচে সরানোর চেষ্টা করছে। টুনি এসব কিছুই দেখেনি ভান করে ঝুনু খালার প্রশ্নের উত্তর দিল, “মনে কর ডিম ফ্রিজে নাই, বাইরে আছে।“

“হাঁস না মুরগি?”

“মুরগি।”

“ছোট সাইজ না বড় সাইজ?”

টুনি জীবনেও কল্পনা করে নাই একটা ডিম সিদ্ধ করার মধ্যে এতো কিছু থাকতে পারে। মাথা চুলকে বলল, “মাঝারি।”

ঝুমু খালা বলল, “পানি ফোঁটার পর সাড়ে তিন মিনিট। তারপরে পানি থেকে বের করে ফেলতে হবে। তা না হলে বেশি সিদ্ধ হয়ে যাবে।”

“থ্যাংকু ঝুমু খালা। আমার একটা সায়েন্স প্রজেক্টে ডিম সিদ্ধ করতে

হবে। তোমার কাছ থেকে জেনে গেলাম

“ডিম হচ্ছে খাওয়ার জিনিস। এই গুলান খায়। এই গুলান দিয়ে সান্সি মান্সি করা ঠিক না!”

“সান্সি মান্সি না। সায়েন্স প্রজেক্ট।”

“একই কথা।

টুনি যেটা দেখতে চেয়েছিল সেটা দেখে ফেলেছে। এখন সে চলে যেতে পারে। কিন্তু সে ভান করল হঠাৎ করে সে কাগজের প্যাকেটগুলো দেখেছে। উত্তেজিত হয়েছে ভান করে এগিয়ে বলল, “এগুলা কি কবিরাজ চাচা?”

কাচু কবিরাজ বলল, “হ্যাঁ-হ্যাঁ-ইয়ে মানে ইয়ে—”

“আপনার বিজ্ঞাপন? “

কাচু কবিরাজ আবার মাথা চুলকে বলল, “মানে ইয়ে-ইয়ে-“

টুনি বলল, “আমি এক কপি নেই?” বলে মতি কবিরাজকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে প্যাকেটের ফাঁক দিয়ে এক কপি টেনে বের করে নিল। রঙিন লিফলেট, সেখানে কাচু কবিরাজের ছবি। চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে। একজন মানুষ কোথাও ছবি দিতে হলে এরকম চোখ পাকানো ছবি দেয় কেন? হাসি খুশি ছবি দিলে কী হয়?

লিফলেটের উপর বড় বড় করে কাচু কবিরাজের নাম, তার নিচে কাচু কবিরাজ স্বপ্নে প্রাপ্ত মহৌষধ দিয়ে কী কী অসুখের চিকিৎসা করতে পারে তার বর্ণনা। টুনি কাগজটা নিয়ে বের হওয়ার জন্য দরজার দিকে রওনা দিল। যাওয়ার সময় পা দিয়ে ঠেলে একটা ওষুধের পাতাও বের করে আনল!

বাইরে বের হয়ে টুনি ওষুধের পাতাটা হাতে তুলে নেয়। কটমটে একটা নাম, কিসের ওষুধ কে জানে। শাহানা আপুকে দেখালে নিশ্চয়ই বের করে ফেলবে। সে ওষুধের খালি পাতাটা নিয়ে উপর তলায় রওনা দিল।

.

ওষুধের পাতাটা দেখে শাহানা আপু বলল, “কোথায় পেয়েছিস?”

“তোমাকে বলব। কিন্তু আগে বল এটা কিসের ওষুধ।”

শাহানা আপু কটমটে নামটা পড়ে বলল, “মনে হয় কোনো একটা এন্টিবায়েটিক। পেনিসিলিন গ্রুপের মনে হয়।”

তারপর পাশে রাখা ল্যাপটপটা অন করে সেখানে খোঁজা শুরু করল একটু পরে বলল, “ঠিকই বলেছি, “এটা একটা স্ট্রং এন্টিবায়োটিক—- পেনিসিলিন গ্রুপের। সাবধানে খেতে হয় অনেক সাইড এফেক্ট হতে পারে। কে খায় এটা?”

টুনি বলল, “কেউ খায় না।”

শাহানা আপু পাতাটা উল্টে পাল্টে বলল, “কেউ খায় না মানে? এই যে খালি পাতা–কেউ নিশ্চয়ই খেয়েছে।

“উহুঁ।” টুনি মাথা নাড়ল, বলল, “কেউ খায় নাই। ওষুধগুলো বের করে গুড়া করে কৌটায় মাঝে রেখেছে।”

শাহানা আপু চোখ বড় বড় করে বলল, “সে কী? কেন?”

“মনে হয় অন্য একটা নাম দিয়ে কাউকে খেতে দিবে।“

“কী বলছিস আবোল তাবোল? কে এটাকে অন্য নাম দিয়ে খেতে দেবে?”

“বিখ্যাত কাচু কবিরাজ। এইটাই মনে হলো স্বপ্ন প্রাপ্ত মহৌষধ।” শাহানা বলল, “কী বলবি পরিষ্কার করে বল। উকিলের মতো প্যাচিয়ে কথা বলিস না!”

শাহানা তখন তার হাতের লিফলেটটা শাহানা আপুকে পড়তে দিল। পড়তে গিয়ে শাহানা আপুর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। বলল, “কী সর্বনাশ! এই লোক এইভাবে এই এন্টিবায়োটিকটা স্বপ্নে প্রাপ্ত মহৌষধ হিসেবে খাওয়াচ্ছে? কত বড় দুই নম্বুরি। কত ডেঞ্জারাস।”

টুনি মাথা নাড়ল। শাহানা আপু আরো উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগল, “প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক কেনার কথা না। কত রকম সাইড এফেক্ট হতে পারে। শুধু কী তাই? ফুল কোর্স শেষ না করলে জার্মগুলো আরো তেজি হয়ে যায়। তখন কোনো এন্টিবয়োটিক দিয়ে কাজ হয় না।”

টুনি আবার মাথা নাড়ল।

শাহানা আপু বলল, “এই লোককে পুলিশে দেওয়া দরকার। “

টুনি এবারে জোরে জোরে মাথা নাড়ল।

শাহানা আপু নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “এই লোকের কত বড় সাহস! আমাদের বাসায় বসে এই দুই নম্বুরি কাজ করে যাচ্ছে!” হঠাৎ করে থেমে গিয়ে টুনির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “কিন্তু তুই কেমন করে এগুলো বের করলি?”

টুনি লাজুক মুখে হাসল, বলল, “এই তো একটু কায়দা করে। ঝুমু খালা একটু সাহায্য করেছে।”

শাহানা আপু মাথা নাড়ল, "তুই আসলেই ডিটেকটিভ। এখন কী করবি ঠিক করেছিস?"

"না। কিন্তু –"

"কিন্তু কী?"

"মানুষটা দাদির গ্রামের মানুষ। এইখানে কয়দিনের জন্য থাকতে এসেছে। এখন আমরা যদি তাকে কিছু করি দাদির একটু খারাপ লাগতে পারে।"

"তাহলে আমরা কিছু করব না? তাকে এভাবে এইগুলা করতে দিব?"

টুনি জোরে জোরে মাথা নাড়ল, বলল, "না। আমি সেইটা বলি নাই। আমি বলছিলাম মানুষটা নিজেই যদি সবকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে চলে যায় তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়।"

"নিজে সবকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে চলে যাবে কেন?"

"যদি ভয় দেখানো যায়।"

শাহানা অপু ভুরু কুঁচকে বলল, "ভয়? ভয় দেখাবি কীভাবে?"

"আমি একা পারব না। তুমি যদি একটু সাহায্য কর।"

"আমি?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে?"

টুনি মাথা চুলকে একটু হাসার ভঙ্গী করল, তারপর তার বুদ্ধিটা সে শাহানা আপুকে বলতে শুরু করে।

.

রাত্রিবেলা দাদির ঘরে সবাই একত্র হয়েছে। দাদি তার সিরিয়াল দেখছেন, দাদির কাছে ঝুমু খালা বসে আছে, সিরিয়ালের চরিত্রগুলোর কাজকর্ম দেখে খুবই বিরক্ত হয়ে সে মাথা নাড়ছে। বাচ্চারা কান ধরে টানাটানির একটা বিপজ্জনক খেলা আবিষ্কার করেছে, সবাই সেটা দেখেও না দেখার ভান করছে। কাচু কবিরাজ একটা চেয়ারে বসে বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে মাথা নাড়ছে। কাছাকাছি আরেকটা চেয়ারে শাহানা আপু বসে একটা বই পড়ছে। শাহানা আপু হঠাৎ তার টেলিফোনটা বের করে সেটার দিকে তাকালো, সেখানে কিছু একটা দেখে টেলিফোনে কোথাও ডায়াল করে সে কানে লাগালো।

টুনি ছাড়া আর কেউ শাহানা আপুর কাজকর্ম লক্ষ করছে না, লক্ষ করার কথাও না। শাহানা আপু নিচু গলায় দুই একটা কথা বলল, তারপর কিছু একটা শুনল এবং হঠাৎ করে প্রায় চিৎকার করে বলল, "কী বললি?"

এবারে ঘরের সবাই মাথা ঘুরিয়ে শাহানা আপুর দিকে তাকালো। বাচ্চারা খেলা বন্ধ করে শাহানা আপুর কথা শোনার চেষ্টা করল। শাহানা কিছু একটা শুনল, তারপর প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, "কী সর্বনাশ! ইম্পসিবল!"

শাহানা আপু এবারে ফোন কানে লাগিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, "না-না-না হতেই পারে না।" তারপর টেলিফোন কানে লাগিয়ে কিছু একটা শুনতে শুনতে ঘর থেকে বের হয়ে

গেল এবং সব বাচ্চা খেলা বন্ধ করে তাদের শাহানা আপুর পিছু পিছু যেতে লাগল।

দাদি পর্যন্ত তার সিরিয়াল দেখা বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন, হয়েছে?"

ঝুমু খালা মাথা নেড়ে বলল, "কবে কেডা? অবস্থা জটিল মনে হয়।"

সবাই শাহানা আপুর টেলিফোন শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। শাহানা আপু শেষ পর্যন্ত টেলিফোনে কথা শেষ করে ঘরে ঢুকলো, দাদির (কিংবা নানি) দিকে তাকিয়ে বলল, "নানি, তোমার সাথে কথা বলতে হবে।"

"কী কথা?"

"নিরিবিলি হলে ভালো হয়।"

"এই বাসায় নিরিবিলি কই পাবি? যা বলতে হয় বলে ফেল।

বাচ্চারা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল, বলল, "বলে ফেল শাহানা আপু।

শাহানা বলল, "আমার এক বন্ধুর বাবা র‍্যাবের খুব বড় অফিসার। সে ফোন করে বলল, র‍্যাব আমাদের বাসা রেইড করতে আসছে।"

একসাথে সবাই চিৎকার করে উঠল, "র‍্যাব? "

"হ্যাঁ। দেশে এন্টিবায়োটিকের উল্টাপাল্টা ব্যবহার করার কারণে সব জার্ম আস্তে আস্তে সুপার জার্ম হয়ে যাচ্ছে। কোনো ওষুধ

এখন কাজ করে না। র‍্যাব অনেকদিন থেকে বের করার চেষ্টা করছে কারা এটা করে।

দাদি চোখ কপালে তুলে বললেন, "কিন্তু সেই জন্য র‍্যাব আমাদের বাসায় আসবে কেন?"

"তাদের কাছে পজিটিভ ইন্টেলিজেন্ট

পজিটিভ ইন্টেলিজেন্ট আছে যে এই বাসায় এন্টিবয়োটিক দিয়ে উল্টাপাল্টা কাজ হয়। প্রেসক্রিপশান ছাড়া এন্টিবায়োটিক আনা হয়।

দাদি মাথা নাড়লেন, "কিছু একটা ভুল হয়েছে।"

অন্যরাও মাথা নাড়ল, বলল, "ভুল ভুল।"

শুধু টুম্পা শান্তকে জিজ্ঞেস করল, "শান্ত ভাইয়া তুমি কিছু কর নাই তো?"

শান্ত রেগে টুম্পার মাথায় চাটি মারতে চেষ্টা করে বলল, "খবরদার ইয়ার্কি করবি না।"

ঝুমু খালা বলল, "যাইবার দেন খালা। এই বাসায় আইসা কিছু পাইব না তখন চা-নাস্তা খেয়ে চইলা যাইব।"

দাদি বললেন, "কিন্তু কী রকম বেইজ্জতি, এলাকায় সব মানুষ দেখবে র‍্যাব এই বাসা রেইড করছে–"

অন্য কেউ কাচু কবিরাজকে লক্ষ করছিল না, শুধু টুনি তার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সে দেখল শাহানা আপুর কথা শুনে তার মুখটা কেমন জানি ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তার নিচের ঠোঁট

তিরতির করে কাঁপছে। হঠাৎ করে সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তোতলাতে তোতলাতে বলল, "আ-আ-আমার যেতে হবে। এক্ষুণি যেতে হবে।

দাদি (কিংবা নানি), অবাক হয়ে বললেন, "কোথায় যেতে হবে?"

"বা-বাড়ি।"

"বাড়িতে তো যাবেই। কিন্তু এখন কেন?"

"এ-এ-এখনই যাইতে হবে। এখনই—আমার বউয়ের শরীর খারাপ
"এখন হঠাৎ করে টের পেলে তোমার বউয়ের শরীর খারাপ?"

কাচু কবিরাজ প্রশ্নের উত্তর দিল না। কোনোমতে পায়ে স্যান্ডেল ঢুকিয়ে রীতিমতো ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বাচ্চারাও উঠে গেল, সবাই তার পিছনে পিছনে গেল।

ঝুমু খালা জিজ্ঞেস করল, "কবিরাজ সাহেব, আপনে কই যান? কই যান?"

কাচু কবিরাজ তার কথারও উত্তর দিল না। ছুটতে ছুটতে তার ঘরে গিয়ে তালা খুলে ঢুকল। বাচ্চারা তার ঘরের বাইরে এসে ভীড় করেছে। শুনল ভিতরে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। তারপর হঠাৎ টয়লেট ফ্ল্যাশ করার শব্দ শোনা যেতে লাগল। একের পর এক। শান্ত দাঁত বের করে হাসি হাসি মুখে বলল, "মনে হচ্ছে কবিরাজ চাচার পেট নেমে গেছে।"

শুধু টুনি বুঝতে পারল আসলে কবিরাজ চাচা তার এন্টিবায়োটিক ট্যাবলেটের গুড়া টয়লেটে ফ্ল্যাশ করে দিচ্ছে।

ভিতরে কিছুক্ষণ খুটখাট শব্দ হলো। মনে হলো কিছু ঝাড়াপোছা করা হচ্ছে। তারপর কাচু কবিরাজ উদভ্রান্তের মতো চেহারায় ঘর থেকে বের হয়ে এলো। তাকে একটা ঝড়ো কাকের মতো দেখাচ্ছে!

এক হাতে স্যুটকেস, অন্য হাতে তার কাগজের দুটি বান্ডিল নিয়ে কাচু কবিরাজ রীতিমতো ছুটতে থাকে। পিছন থেকে ঝুমু খালা বলল, "আরে! আপনি খায়া যাবেন না?"

কাচু কবিরাজ ছুটতে ছুটতে বলল, "না, না।"

"আপনার মুরগি পাকাইছি। সকাল থেকে সিদ্ধ দিছি। নরম হইছে কিনা টেস্ট কইরা যান।"

"না, না, সময় নাই আমার।"

ঝুমু খালা পিছনে যেতে যেতে বলল, "তাহলে পেলাসটিকের বাটিতে ভইরা দিয়া দেই। লইয়া যান, বউরে খাওয়াইবেন।"

"না। না। দরকার নাই।"

কাচু কবিরাজ দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুটে যেতে থাকে। মানুষটা আছাড় খেয়ে পড়ে কিনা কে জানে!

ঝুমু খালা মাথা নেড়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "মানুষটা ভাত পর্যন্ত খাইল না।

সবাই হেঁটে হেঁটে দাদির ঘরে ফিরে আসে। ঘরে শুধু শাহানা আপু তার টেলিফোন হাতে বসে আছে। শান্ত জিজ্ঞেস করল, "শাহানা আপু, র‍্যাব কখন আসবে?"

“জানি না।“

টুনি বলল, “শাহানা আপু তুমি তোমার বন্ধুকে একটু বুঝিয়ে বল যে আমাদের বাসায় এরকম কিছু নাই। সে যেন তার আব্বুকে বুঝিয়ে বলে।

দাদি বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু চেষ্টা করে দেখ। তোরা না পারলে বড় কাউকে বল। শাহরিয়ারকে বল কথা বলতে। বাসায় র‍্যাব রেইড করবে এটা কী রকম ব্যাপার? কতো বড় লজ্জার ব্যাপার! এটা কি চোর-ডাকাতের বাসা নাকি?

শুধু শান্ত বলল, “না না শাহানা আপু, কিছু বলার দরকার নাই। আসতে দাও। র‍্যাব এসে ঢুকলে একটা ফাটাফাটি ব্যাপার হবে। এরা কী দরজা ভেঙে ঢুকবে?”

কেউ তার কথাকে বেশি গুরুত্ব দিল না। শাহানা আপু তার টেলিফোনটা নিয়ে কথা বলার জন্য উঠে গেল।

ঝুমু খালা মাথা নেড়ে বলল, “কার ভিতরে কী আছে বলা খুবই মুশকিল।”

টুম্পা জানতে চাইল, “কেন ঝুমু খালা?”

“এই যে কবিরাজ মানুষটারে আমি বেশি ভালো পাই নাই। কিন্তু দেখো তার মনের ভিতর বউয়ের জন্য কী রকম মহব্বত। হঠাৎ করে বুঝল যে বউয়ের নিশ্চয়ই শরীর খারাপ হয়েছে, সব কিছু ফালায়া তখন ছুঁইটা গেছে! খায় নাই পর্যন্ত।”

বাচ্চাদের ভিতর সবচেয়ে ছোট হচ্ছে মুনিয়া। সে তার রিনরিনে গলায় বলল, “তুমি বুঝ নাই ঝুমু খালা। তুমি খুবই বোকা।”

“আমি কী বুঝি নাই? “

“কবিরাজ চাচা আসলে এন্টিবান্টি ওষুধ দিয়ে দুই নম্বুরি কাজ করে। সেই জন্যে ভয়ে পালিয়ে গেছে।”

ঝুমু খালা চোখে কপালে তুলে বলল, “কী কইলা তুমি?? কী কইলা?”

“ঠিকই বলেছি।”

টুনি হাসি গোপন করে মুনিয়াকে বলল, “মুনিয়া শব্দটা এন্টিবান্টি না। শব্দটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক।”

মুনিয়া বলল, “একই কথা!” তারপর দাঁত বের করে হাসল।

৫. মশা

দরজায় টুং টাং শব্দ শুনে টুনি দরজা খুলে দেখল ফারিহা আপু দাঁড়িয়ে আছে। ফারিহা আপুকে দেখলেই টুনি খুশি হয়ে যায়, আজকেও খুশি হয়ে গেল। প্রত্যেকবারই ফারিহা আপু নতুন একটা চেহারা নিয়ে আসে, আজকেও এসেছে। চুলগুলো বেগুনি! টুনি ছোট একটা চিৎকার করে বলল, “ফারিহা আপু! তুমি! তোমাকে আজকে কী সুন্দর লাগছে।“

ফারিহা আপু ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, “আমাকে দেখলেই তুমি বলো কী সুন্দর লাগছে! আমার মনে হয় তুমি আসলে বলতে চাও কী আজব লাগছে, সেটা তো আর বলা যায় না তাই বল, কী সুন্দর লাগছে!”

“না ফারিহা আপু! আজব লাগবে কেন? তোমাকে একেবারে অন্যরকম লাগছে, চুলগুলোর এই রংটাতে তোমাকে যা মানিয়েছে না!”

ফারিহা আপু সোফায় বসতে বসতে বলল, “পৃথিবীর অনেক দেশে চুলের কত রকম রং হয়। কালো, বাদামি, সোনালি– আমাদের দেশে খালি কালো রং। কী বোরিং, সেজন্য একটু অন্য রং চেষ্টা করে দেখলাম।”

“ভালো করেছ ফারিহা আপু।”

ফারিহা হাত দিয়ে নিজের চুলগুলোতে একবার হাত বুলিয়ে বলল, “শাহরিয়ার দেখে কী বলবে মনে হয়?”

“ছোটাচ্চু ভান করবে সে লক্ষই করেনি। আর যদি লক্ষ করে তাহলে খুবই খোঁচা মেরে কিছু বলবে।”

“ঠিকই বলেছ! দেখি কী বলে। একটু ডেকে আনো না প্লিজ!”

টুনি ছোটাচ্চুকে ডেকে আনল। ছোটাচ্চু ঘরে ঢুকেই ফারিহা আপুকে দেখে চমকে উঠল, বলল, “তোমার কী হয়েছে?”

ফারিহা আপু বলল, “ঢং করো না। অনেক টাকা দিয়ে রং করিয়েছি কেমন লাগছে বল।”

“সত্যি সত্যি বলব?”

“সত্যি বলবে না তো মিথ্যা বলবে নাকি? বল।”

“মনে হয়েছে মাথায় আগুন লেগে চুলগুলো পুড়ে এরকম বেগুনি হয়ে গেছে!”

টুনি হি হি করে হেসে বলল, “দেখেছ ফারিহা আপু, তোমাকে বলেছিলাম কিনা!”

ছোটাচ্চু সোফায় বসতে বসতে বলল, “কী বলেছিলি?”

ফারিহা আপু উত্তর দিয়ে বলল, “টুনি বলেছিল তুমি খোঁচা মেরে একটা কমেন্ট করবে, সেটাই করেছ।”

ছোটাচ্চু বলল, “আমি মোটেও খোঁচা মারিনি, যেটা সত্যি সেটা বলেছি।”

টুনি বলল, “ছোটাচ্চু তুমি এখন পুরান মডেলের, মানুষের চুল যে অনেক রঙের হতে পারে তুমি সেটা জান না।”

ছোটাচ্চু বলল, “থাক থাক! এতো বেশি জেনে কাজ নেই। কয়েক দিন দেখলে অভ্যাস হয়ে যাবে। বগলে ফোঁড়া উঠলেও আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যায়!”

ফারিহা আপু ছোটাচ্চুকে একটা ছোট ঘুষি দিয়ে বলল, “আমার চুলকে তুমি ফোঁড়ার সাথে তুলনা করছ? তোমার এতো বড় সাহস?”

ছোটাচ্চু নিজেকে রক্ষা করার জন্য একটু সরে গিয়ে বলল, “ঠিক আছে, ঠিক আছে আর বলব না। শুধু এর পরের বার থেকে আমাকে আগে থেকে একটু ওয়ার্নিং দিয়ে রেখো যেন ধাক্কাটা বেশি বড় না হয়!

“এই ধাক্কাতেই তুমি কাহিল হয়ে যাচ্ছ? দেখবে ভবিষ্যতে আরো কত দিক থেকে ধাক্কা আসবে।

ছোটাচ্চু ভয়ের ভঙ্গী করে বলল, “সর্বনাশ!”

ফারিহা আপু বলল, “অনেক হয়েছে। এখন চল, শওকত সাহেব কী বলতে চান শুনে আসি!”

টুনি জিজ্ঞেস করল, “শওকত সাহেব কে?”

ছোটাচ্চু দাঁত বের করে হেসে বলল, “আমি উনার ওয়াইফের এক সেট গয়না চুরির কেস সলভ্ করে দিয়েছিলাম! শওকত সাহেব নিজে সেটা চুরি করেছিলেন! মনে আছে?”

টুনি আর ফারিহা একসাথে মাথা নাড়ল, তাদের মনে আছে!

টুনি বলল, “তোমার বুদ্ধিটা খুবই কিউট ছিল ছোটাচ্চু! আর শওকত সাহেব মানুষটা খুবই ফানি। কেউ কখনো নিজের বউয়ের গয়না চুরি করে?”

ফারিহা আপু বলল, “ধরা পড়ে তার কী আনন্দ!”

ছোটাচ্চু জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, “মনে আছে শওকত সাহেবের ওয়াইফ চোর ধরে দেওয়ার জন্য পেটমোটা একটা খাম দিয়েছিলেন। ভিতরে কচকচ করছিল খালি হাজার টাকার নোট? ইশ!”

“হ্যাঁ! তুমি ভদ্রতা করে নিলে না!” ফারিহা আপুও জিব দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, “এতোগুলো টাকা!”

টুনি বলল, “ছোটাচ্চু, তোমার মনে হয় খুব ক্ষতি হবে না। তোমাকে যখন আবার ডেকে পাঠিয়েছেন তার মানে নিশ্চয়ই তোমাকে কোনো একটা কাজ দেবেন। সেটা যদি করতে পার তাহলেই তো হলো।”

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, “সেটা ঠিক। এখন দেখা যাক কী কাজ দেয়।”

ফারিহাপু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “চল যাই।”

ছোটাচ্চু বলল, “একটু চা খেয়ে যাবে না?”

“নাহ্! একটা কফি হাউজে যখন দেখা করতে চাইছেন তখন সেখানে চা কফি সব পাওয়া যাবে।”

ছোটাচ্চু দাঁড়িয়ে বলল, “তা ঠিক। কিন্তু” বলে সে ভুরু কুঁচকে ফারিহার দিকে তাকাল।

ফারিহা জিজ্ঞেস করল, “কিন্তু কী?”

“তোমার এই চুল দেখে আবার ঘাবড়ে না যান!”

ফারিহা আপা একটা ঘুষি দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, “আরেকবার আমার চুল নিয়ে একটা কথা বললে ঘুষি মেরে তোমার চ্যাপ্টা টাইপের নাকটা আরো চ্যাপ্টা করে দেব।”

ছোটাচ্চু বলল, “ঠিক আছে বলব না।” একটু পর নিজের নাকটা একটু টেনে বলল, “আমার নাকটা কী আসলেই চ্যাপ্টা টাইপ?”

কেউ উত্তর দিল না, টুনি শুধু হি হি করে হাসল। ছোটাচ্চুর নাক মোটেও চ্যাপ্টা না।

.

কফি হাউজে শওকত সাহেবকে খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগল, যদিও তিনি একেবারে সামনে বসেছিলেন। আসলে

ছোটাচ্চু আর ফারিহা শেষবার যখন তার বাসায় তাকে দেখেছিল তখন তিনি ছিলেন প্রায় ঘুমের পোশাক পরে একেবারে এলোমেলো অবস্থায়। ছোটাচ্চু আর ফারিহার মনের মধ্যে সেই ছবিটাই রয়ে গেছে। তারা টাকপড়া মোটাসোটা একজন ঢিলেঢালা মানুষ খুঁজে যাচ্ছিল। কিন্তু আজকে শওকত সাহেব একেবারে স্যুট টাই পরা চোখে চশমা ফিটফাট মানুষ, দেখে চেনারই উপায় নেই। শওকত সাহেবই ছোটাচ্চু আর ফারিহাকে প্রথম দেখে ডাকলেন, "এই যে ইয়ংম্যান এন্ড ইয়ং লেডি- আমি এখানে।"

ছোটাচ্চু আর ফারিহা এগিয়ে গেল, সালাম করে তার সামনে বসল। শওকত সাহেব তার হাতের পত্রিকাটা ভাঁজ করে পাশে রেখে তাদের দিকে তাকিয়ে হাসিহাসি মুখে বললেন, "তারপর কী খবর তোমাদের? লং টাইম নো সি।"

ফারিহা বলল, "আমার সেরকম কোনো খবর নাই। অফিসে যাই ফেরত আসি। কাজকর্ম নাই কিন্তু বেতন দিয়ে যাচ্ছে।"

ছোটাচ্চু বলল, "আমার জীবন আরো সহজ। কাজকর্ম নাই বেতন ও নাই। থাকা খাওয়া ফ্রী সেজন্যে চিন্তাও নাই।"

একটা ফাটাফাটি রসিকতা শুনেছেন সেরকম ভাব দেখিয়ে শওকত সাহেব শব্দ করে হাসলেন, আশপাশে অনেকেই মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে রসিকতাটা কী নিয়ে বোঝার অনুমান করল। শওকত সাহেব এক সময় হাসি থামিয়ে বললেন, "তোমাদের দুজনকেই খুব চমৎকার দেখাচ্ছে। ইয়ং, এনার্জেটিক এন্ড ফ্রেশ!"

ছোটাচ্চু তার গালের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, "জী, কাজ কর্ম না থাকলে সব সময় ফ্রেশ থাকা যায়!"

“এরকম সৌভাগ্য সবার হয় না। যতদিন পার এনজয় করে নাও!”

ফারিহা বলল, “বেশি এনজয় করে ফেলছে বলে মনে হচ্ছে!”

শওকত সাহেব ফারিহার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোমার চুলের রংটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে! আমার মাথায় যদি গোটা পঞ্চাশেক চুলও থাকতো তাহলে তোমার মতো রং করে ফেলতাম!”

ছোটাচ্চু একটু কল্পনা করে দেখার চেষ্টা করল, শওকত সাহেবের মাথায় অনেক চুল এবং সেই চুলের রং বেগুনি! কল্পনাটা সে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারল না–শওকত সাহেব বললেন, “তোমরা কী খাবে? এখানে খুব ভালো চিজ কেক তৈরি করে।

ফারিহা বলল, “ভালো না মন্দ তাতে কিছু আসে যায় না। চিজ কেক হলেই আমি খাব।”

ছোটাচ্চু বলল, “যে কোনো জিনিস মিষ্টি হলেই আমি খেতে পারি।”

শওকত সাহেব বললেন, “আমার মিষ্টি খাওয়া নিষেধ, কিন্তু ধরে নিচ্ছি তোমরা আমাকে চাপ দিয়ে জোর করে খাওয়াচ্ছ। চিজ কেকের সাথে কফির কোনো তুলনা নেই। ব্ল্যাক হলে আরো ভালো।

ছোটাচ্চু কফি খেতে পারে না, বিশেষ করে কালো কফি তার দুই চোখের বিষ কিন্তু এখন না করতে পারল না।

কফি এবং কেকের কথা বলে শওকত সাহেব কাজের কথায় চলে এলেন। কোনো রকম ভূমিকা না করে শুরু করে দিলেন,

বললেন, “ডিটেকটিভ শাহরিয়ার তোমাকে আমি একটা জরুরি কাজে ডেকেছি।”

ছোটাচ্চু জরুরি কাজের উপযোগী একটা ভাব মুখে ধরার চেষ্টা করতে লাগল। বলল, “বলেন, দেখি আমি সাহায্য করতে পারি কিনা।”

শওকত সাহেব একবার ফারিহার দিকে তাকালেন তারপর বললেন, “সত্যি বলতে কী, আমি চাইব শাহরিয়ার সাহেবের সাথে ফারিহাও যেন থাকে, দুইজনের টিম হলে আরো ভালো।”

ফারিহা বলল, “আমি যেহেতু একটা চাকরি করছি তাই অন্য জায়গায় সময় দিতে পারব না। তাছাড়া শাহরিয়ারের কাজকর্মে আমার কিছু করার নেই। আমি গাড়ি চালিয়ে শাহরিয়ারকে মাঝে মাঝে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাই। এ ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা আমার নাই।”

ছোটাচ্চু বলল, “এবং মাঝে মাঝে আমাকে টাকা ধার দাও।”

“ধার?” ফারিহা চোখ কপালে তুলে বলল, “যে টাকাটা ফেরত দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে ধার! “

“ফেরত দেওয়া হয় নাই বলে যে ফেরত দেওয়া হবে না সেটা কেন ধরে নিচ্ছ?”

শওকত সাহেব বললেন, “আমার প্রস্তাবটায় তুমি যদি রাজি হও তাহলে তোমার টাকা ধার এবং টাকা শোধের ব্যাপারটারও একটা সমাধান হয়ে যাবে। আমি যে কোনো সার্ভিসের উপযুক্ত মূল্য দেওয়া বিশ্বাস করি।”

ছোটাচ্চু দুর্বল গলায় বলল, "এখনও কাজটা কী সেটা বলেন নাই। আমি করতে পারব কিনা সেটা এখনও জানি না।"

"তুমি পারবে। তুমি না পারলে আমি তোমাকে বলতাম না।"

ছোটাচ্চু চুপ করে রইল। শওকত সাহেব বললেন, "তোমার কাজ মোটামুটি সহজ। মতিঝিলে আমার বিজনেসের যে বিল্ডিং আছে সেখানে তোমাকে একটা অফিস রুম দেব, তুমি মাঝে মাঝে এসে সেই অফিসে বসবে। চা কফি খাবে, আমার সাথে এবং আমার স্টাফদের সাথে মাঝে মাঝে কথা বলবে। কম্পিউটারের সামনে বসবে। কিছু সময় কাটাবে, তারপর চলে যাবে।"

ছোটাচ্চু বলল, "কিন্তু কী করতে হবে?"

"কিছু করতে হবে না।

ছোটাচ্চু মুখটা হা করে কিছু একটা বলতে গেল, কিন্তু কী বলবে সেটা বুঝতে না পেরে মুখটা হা করে বসে রইল। সেই দৃশ্য দেখে ফারিহা হঠাৎ হি হি করে হাসতে শুরু করল, হাসি আর থামাতে পারে না।

শওকত সাহেব একটু অবাক হয়ে একবার ছোটাচ্চুর দিকে আরেকবার ফারিহার দিকে তাকালেন তারপর বললেন, "কী হলো? হাসছ কেন?"

ছোটাচ্চু কথা বলার চেষ্টা করল, "মা-মা-মানে — "

ফারিহা হাসি থামিয়ে ছোটাচ্চু যেটা বলার চেষ্টা করছে সেটা বলে দিল, "মানে, শাহরিয়ার বলতে চাইছে, শুধু মাঝে মাঝে চা খাওয়ার

জন্য আপনি তাকে অফিস দেবেন, টাকা-পয়সা দিবেন এটা সে বুঝতে পারছে না! তাই না শাহরিয়ার?"

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কোনো কিছু না করা কেমন করে একটা কাজ হয়।"

শওকত সাহেব হাসি হাসি মুখে বললেন, "ঠিক আছে আমি তোমাকে বোঝাই। প্রথম কথা হচ্ছে মাঝে মাঝে আমার অফিস বিল্ডিংয়ে গিয়ে চা খাওয়ার এই কাজটা কিন্তু আমি যদু মধুঁকে দিব না, তোমাকে দিচ্ছি। তার কারণ তুমি হচ্ছ বিখ্যাত ডিটেকটিভ শাহরিয়ার- "

ছোটাচ্চু দুর্বলভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল, "আমি আসলে ঠিক বিখ্যাত কোনো ডিটেকটিভ না, সখে–"

শওকত সাহেব ছোটাচ্চুকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি বড় ডিটেকটিভ না ছোট ডিটেকটিভ সেটা আমার আলাপের বিষয় না। আমার যেরকম মানুষ দরকার তুমি হচ্ছ সেরকম একজন মানুষ। তুমি যে স্টাইলে আমার স্ত্রীর গয়নার সেটের চোরকে ধরেছিলে সেটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল।" শওকত সাহেব তখন হা হা করে আবার অনেক জোরে জোরে শব্দ করে হাসতে শুরু করলেন। শুধু আশপাশের না, কফি হাউজের প্রায় সবাই তখন মাথা ঘুরিয়ে শওকত সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসির কারণটা অনুমান করার চেষ্টা করল। শওকত সাহেব একসময় হাসি থামিয়ে বললেন, "আমি একটু খোঁজ-খবরও নিয়েছি, পত্রপত্রিকায় ও টেলিভিশনে তোমার ওপর যে খবর বের হয়েছে আমি সেগুলোও দেখেছি। ছোট বাচ্চাদের সাথেও তুমি খুব ফ্রি, তোমার একজন ভাইঝি না হয় ভাগ্নীকে নিয়েও তুমি কাজ কর সেটা খুবই ইন্টারেস্টিং!"

শওকত সাহেব তার কফিতে চুমুক দেওয়ার জন্য একটু থামলেন, তখন ছোটাচ্চু বলল, “হ্যাঁ আমার এই ভাতিঝিটা খুবই ব্রাইট! নাম টুনি আমি মাঝে মাঝে টুনটুনি ডাকি!”

ফারিহা বলল, “আমার ধারণা টুনির আইকিউ একশ পঞ্চাশ না হয় একশ ষাট হবে। আরো বেশিও হতে পারে?“

শওকত সাহেব বললেন, “আমার আইকিউ টেনেটুনে চল্লিশ হবে কিনা সন্দেহ। যাক, যেটা বলছিলাম। আমার মোটামুটি একটা বড় বিজনেস হাউজ আছে, সেখানে এমপ্লয়ি প্রায় শ খানেক। কিসের বিজনেস, কেমন করে বিজনেস করতে হয়, কত টাকা টার্ন ওভার, এসেট কত, ক্যাশ ফ্লো কত সেগুলো কিছুই আমি তোমাকে বলছি না–

ছোটাচ্চু বলল, “থ্যাংক ইউ। বললেও আমি কিছু বুঝতাম না।”

“তোমার বোঝার দরকারও নাই। যাই হোক, যে কোনো বিজনেসে

কিছু বিজনেস সিক্রেট থাকে। আমারও আছে। কিছু কিছু সিক্রেট আছে যেটা আমি ছাড়া কেউ জানে না। কিছু আছে হয়তো টপ লেভেলের চার পাঁচ জন জানে। কিছু আছে যেটা মিডলেভের পনেরো কুড়ি জন জানে। কিছু হয়তো অনেকেই জানে। একটা বড় বিজনেস চালাতে হলে এভাবেই থাকতে হয় এবং অনেক দিন এভাবেই চলেছে। কিন্তু –”

“কিন্তু কী? “

“আমার মনে হচ্ছে আমার এই সিস্টেমে ফাটল ধরেছে। আমার কিছু সিক্রেট আর সিক্রেট থাকছে না। এটা একটা বড় সমস্যা।

কে বা কারা এটা করছে, কীভাবে করছে আমি ধরতে পারছি না। আমি সেজন্য তোমার সাহায্য নিচ্ছি।”

ছোটাচ্চু বলল, “আ-আমার সেই মানুষগুলোকে ধরতে হবে?”

“না। তুমি শুধু আমার অফিসে মানুষগুলোকে ধরার ভান করবে। তাতেই কাজ হবে। মানুষগুলো ভয় পেয়ে সাবধান হয়ে যাবে। আপাতত এটুকু হলেই আমার কাজ চলে যাবে!”

“কাজ চলে যাবে?”

“হ্যাঁ। আগামী এক দুই মাসে আমার একটা অনেক বড় ডিল ফাইনাল হবে, এই সময়ে আমি কোনো ঝামেলা চাই না। আমি একটু নিশ্চিন্তে কাজ করতে চাই।”

“আপনার ধারণা আমি আপনার অফিসে গিয়ে চা কফি খেলেই সেটা হয়ে যাবে?”

“হ্যাঁ। আমি আগে থেকে সবাইকে জানিয়ে রাখব বিখ্যাত ডিটেকটিভ শাহরিয়ারকে অনেক কষ্টে আমি রাজি করিয়েছি, সে কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করবে, আমার কোম্পানিটাকে পরিশুদ্ধ করে দেবে। সবাই যেন তাকে সাহায্য করে, সে যে তথ্য জানতে চায় সেটাই যেন তাকে জানানো হয়।”

ছোটাচ্চু বলল, “তার মানে আপনার পুরো অফিসের সবাইকে আমার ধোঁকা দিয়ে যেতে হবে?”

শওকত সাহেব হাসলেন, “আমার বাসায় আমি দেখেছি এই কাজটা তুমি খুব ভালো পার!

ফারিহা আবার হিহি করে হাসতে শুরু করল। ছোটাচ্চু একটু রেগে বলল, "কী হলো? তুমি হাসছ কেন?"

ফারিহা কষ্ট করে হাসিটাকে থামিয়ে বলল, "শেষ পর্যন্ত তোমার আসল গুণের একটু কদর হলো! তুমি যেটা সবচেয়ে ভালো পার সেটাই তুমি করার সুযোগ পেলে।" কথা শেষ করে ফারিহা আবার হি হি করে হাসতে লাগল!

ছোটাচ্চু চোখ পাকিয়ে বলল, "ফারিহা, সব কিছু নিয়ে ঠাট্টা করা তোমার একটা অভ্যাস হয়ে গেছে! আমরা একটা জরুরি ব্যাপার নিয়ে কথা বলছিলাম তার মাঝে তুমি হি হি করে হাসতে শুরু করলে!'

ফারিহা হাসি থামিয়ে বলল, "ঠিক আছে হাসি থামাচ্ছি!"

ছোটাচ্চু তখন আবার শওকত সাহেবের দিকে তাকালো তারপর বলল, "কিন্তু শওকত সাহেব, আপনাদের এতো হাইফাই অফিস, কত রকম ড্রেস কোড, কখন কী পরবে তার নিয়ম-কানুন, কথা বলার কতো রকম স্টাইল তার মাঝে আমি সম্পূর্ণ বেমানান, আমি জীবনে টাই পরিনি, কীভাবে টাইয়ের নট বাঁধতে হয় সেটাও জানি না!"

শওকত সাহেব আবার শব্দ করে হাসলেন, বললেন, "তোমাকে আমি এই দায়িত্বটা দিতে যাচ্ছি তার একটা বড় কারণ হচ্ছে তোমার পোশাক! তুমি যেভাবে থাকো ঠিক সেভাবে আসবে যেন অফিসের সবার মাঝে তোমাকে আলাদাভাবে দেখা যায়–একটা মূর্তিমান ব্যতিক্রম। মাঝে মাঝে যদি ফারিহা আসতে পারে আরো ভালো। তরুণ বেপরোয়া ডিটেকটিভ এবং তার বেগুনি চুলের সহকর্মী!"

ফারিহা চমকে উঠল, “আমার বেগুনি চুল?”

“হ্যাঁ। তোমাকে দেখেই মনে হয়েছে এটাই তো দরকার! নতুন জেনারেশনের ক্যাজুয়েল পোশাক, ক্যাজুয়াল ব্যবহার কিন্তু অসাধারণ কাজ! তোমরা কী দেখেছ নতুন জেনারেশনের সব বড় বড় মানুষ জিন্স টি-শার্ট পরে বড় বড় কাজ করে?”

ছোটাচ্চু দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল। ফারিহা আবার হাসতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে থেমে গেল। শওকত সাহেব ছোটাচ্চুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “তাহলে কী আমি ধরে নিতে পারি তোমাকে পাচ্ছি?”

ছোটাচ্চু একটু ইতস্তত করছিল কিন্তু ফারিহা বলল, “হ্যাঁ পাচ্ছেন! আপনি চিন্তা করবেন না। শাহরিয়ার গাইগুই করলেও আমি ধরে নিয়ে যাব!”

“ভেরি গুড। এখন তাহলে শেষ কাজটা বাকি রয়েছে। সেটা হচ্ছে শাহরিয়ারের ব্যাংক একাউন্ট নম্বর।”

ছোটাচ্চু বলল, “ব্যাংক একাউন্ট নম্বর?”

“হ্যাঁ। আমার বাসায় রওশন একটা খামে করে তোমাকে তোমার ফি দিতে চেয়েছিল তুমি নাওনি। আমি চিন্তা করে দেখেছি কারো হাতে টাকা

দেওয়াটা রুচিহীন কাজ। এটা সরাসরি ব্যাংক একাউন্টে চলে যাওয়া উচিত।”

ছোটাচ্চু বলল, “কিন্তু আমার তো ব্যাংক একাউন্টের নম্বর মনে নেই!” ফারিহা বলল, “আমার মনে আছে।”

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে বলল, “তোমার মনে আছে? কেমন করে? “দুইদিন পর পর যদি তোমার বেকার ডিটেকটিভ বন্ধুকে টাকা ধার দিতে হতো তাহলে তোমারও মনে থাকতো।”

ছোটাচ্চু মাথা নাড়ল, বলল, “তুমি একেবারে নম্বরটা মুখস্ত করে ফেলেছ?”

“হ্যাঁ। তাহলে সময় বাঁচে।”

ফারিহা একটা কাগজে ছোটাচ্চু ব্যাংক নম্বরটা লিখে দিল। শওকত সাহেব কাগজটা এক নজর দেখে তার পকেটে রেখে বললেন, “তাহলে এভাবেই ঠিক হলো, আমি আমার কোম্পানি থেকে তোমাকে একটা চিঠি পাঠাব কনসাল্টটেন্ট হিসেবে কাজ করার জন্য। তুমি সেটাতে রাজি হয়ে আমাকে জানানোর পর কাজ শুরু করে দেবে।”

ছোটাচ্চু একবার ফারিহার দিকে তাকালো, ফারিহা মুখ টিপে হেসে বুড়ো আঙুল উঁচু করে ছোটাচ্চুকে সাহস দিল। ছোটাচ্চু শওকত সাহেবের দিকে তাকিয়ে দুর্বল গলায় বলল, “ঠিক আছে!”

.

শওকত সাহেবের ফার্মে কাজ করার জন্য ছোটাচ্চু রেডি হতে শুরু করল। শেভ করা বন্ধ করে দিয়ে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজাতে দিল। চুল আঁচড়ানো বন্ধ করে দিল, খুব দরকার হলে আঙুল দিয়ে চুলগুলো একটু গুছিয়ে নেয়। কালো রঙের ভুসভুসে একটা টি-শার্ট খুঁজে বের করে সেটাকে আরো কুঁচকানোর জন্য সেটা পরে ঘুমাতে শুরু করল। তার জিন্সের প্যান্টের একটা হাঁটু দেওয়ালের সাথে ঘষে ঘষে প্রায় ছিঁড়ে ফেলল। তার পুরানো টেনিস সু বের করে ময়লা জমার জন্যে ছাদে ফেলে রাখল। দামি

একটা গগলস আর ব্যাকপেক কিনে আনল। দামি ব্যাক পেকটা শাহানাকে দিয়ে শাহানার পুরানো এবং ময়লা ব্যাকপেকটা নিয়ে নিল। শাহানা অবশ্য তার ব্যাকপেকটা দিতে চাইছিল না। ছোটাচ্চু বলল দরকার হলে সে যখন খুশি তার ব্যাকপেকটা নিয়ে নিতে পারে। গগলসটা নিয়ে একটু সমস্যা হলো, গগলস পরার অভ্যাস না থাকায় এটা চোখে দিয়ে ঘরের ভিতরে হাঁটাহাঁটি করার সময় ছোটাচ্চু এখানে সেখানে ধাক্কা খেতে লাগল!

শুধু যে তার বাইরের চেহারাটা পরিবর্তন করল তা নয় সে তার চলাফেরারও পরিবর্তন করতে শুরু করল। একটা চেয়ারে বসলেই পা দুটো টেবিলের উপর তুলে দিতে লাগল। কারো সাথে দেখা হলে তার সাথে হ্যান্ডশেক না করে "হাই ফাইভ" কিংবা "ফিস্ট বাম্প" করা প্র্যাকটিস করতে লাগল। যখন সে মোটামুটি তার চেহারা এবং চালচলনে অভ্যস্ত হয়ে গেল তখন শওকত সাহেবকে ফোন করে জানাল সে পরের দিন আসছে। শওকত সাহেব রাজি হওয়ার পর ছোটাচ্চু ফারিহাকে ফোন করল, প্রথম দিন সে ফারিহাকেও সাথে নিয়ে যেতে চায়।

.

শওকত সাহেবের অফিস বিল্ডিংটার গেটের মানুষটা ছোটাচ্চু আর ফারিহাকে দেখা মাত্র লাফ দিয়ে উঠে বিশাল বড় একটা সালাম দিয়ে গেট খুলে দাঁড়াল। ছোটাচ্চু হালকা একটা শিস দিতে দিতে গগলসটা মাথার উপর তুলে লিফটের সামনে দাঁড়াল। গেটে দাঁড়ানো মানুষটা বিনয়ে একেবারে মাটির সাথে মিশে গিয়ে বলল, "স্যার চার তলায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। লিফটের তিন।"

ছোটাচ্চু আর ফারিহা লিফটের তিন টিপে চার তলায় পৌঁছল। লিফট থেকে বের হয়ে কাঁচের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “মিস্টার শাহরিয়ার এন্ড মিস ফারিহা?”

ছোটাচ্চু বলল, “ইয়াপ!” সেটা শুনে ফারিহা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল!

রিসেপশনিস্ট মেয়েটা বলল, “আসেন প্লিজ। স্যার আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।”

ছোটাচ্চু আর ফরিহা মেয়েটার পিছু পিছু গেল। বড় একটা অফিস ঘরের দরজা খুলে মেয়েটা মাথা ঢুকিয়ে বলল, “স্যার, উনারা চলে এসেছেন।”

শওকত সাহেব বলল, “নিয়ে আস।”

মেয়েটা দরজা থেকে সরে তাদের ভিতরে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। ছোটাচ্চু মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে ভিতরে ঢুকল। বিশাল অফিস রুম, সামনে স্যুট টাই পরা আরো দুইজন বসেছিল। শওকত সাহেবের সাথে সাথে এই মানুষ দুইজনও দাঁড়িয়ে গেল! শওকত সাহেব হাসি হাসি মুখে বললেন, “হ্যালো ডিটেকটিভ শাহরিয়ার এন্ড ফারিহা ম্যাডাম! ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রেস!”

ছোটাচ্চু এগিয়ে গিয়ে তার সাথে ফিস্ট বাম্প করে, তারপর ব্যাকপেকটা নিচে রেখে একটা চেয়ারে বসে পড়ল!

শওকত সাহেব বললেন, “শাহরিয়ার আমার ফার্মে একটু সময় দেওয়ার জন্য তোমাকে যে কীভাবে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না।“

শাহরিয়ার বলল, “নো প্রবলেম!”

শওকত সাহেব ফারিহার দিকে তাকিয়ে বললেন, “ফারিহা তোমাকেও ধন্যবাদ শাহরিয়ারকে রাজি করানোর জন্য!”

ফারিহা বলল, “আশা করছি যে জন্য শাহরিয়ারকে এনেছেন সেটা যেন সে করতে পারে।“

“পারবে, পারবে। নিশ্চয়ই পারবে। শাহরিয়ার হাত দিয়েছে আর সমস্যা সমধান হয়নি, আমি এখনো দেখিনি।” শওকত সাহেব এবার তার সামনে বসে থাকা দুজনকে দেখিয়ে বলল, “এরা আমার সিনিয়ার ম্যানেজমেন্টের দুইজন। আর আপনারা তো বুঝতেই পারছেন ইনি হচ্ছেন ডিটেকটিভ শাহরিয়ার, যার কথা আপনাদের বলেছিলাম।”

স্যুট পরা মানুষ দুইজন জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, “জী জী বুঝতে পারছি। স্যার আমাদেরকে আপনার কথা বলেছেন।”

শওকত সাহেব বললেন, “আপনারা সবাইকে আমাদের কনফারেন্স রুমে আসতে বলেন, ছোট একটা টি-ব্রেক। আমি শাহরিয়ার আর ফারিহাকে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।”

ফারিহা বলল, “না, না, আমাকে পরিচয় করাতে হবে না। আমি এখন যাব, অফিসের কাজ ফেলে এসেছি।”

“এক কাপ চা না হয় কফি খেয়ে যাও।”

“আরেক দিন খাব, আজ যাই।”

“তাহলে অন্তত শাহরিয়ারের অফিসটা দেখে যাও।”

ফারিহা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “হ্যাঁ। সেটা দেখে যেতে পারি।”

স্যুট পরা দুইজন উঠে বের হয়ে যাওয়া মাত্রই শওকত সাহেব হা হা করে হেসে শাহরিয়ারকে বললেন, “তোমার পোশাকটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এই টি-শার্টটা কোথা থেকে ম্যানেজ করলে?”

“সোফার নিচে পড়েছিল।”

“ফ্যান্টাস্টিক! আর জিন্সটা?”

“ঘষে ঘষে হাঁটুটা ছিঁড়েছি।”

শওকত সাহেব হা হা করে হেসে বললেন, “সবচেয়ে ভালো হয়েছে তোমার ফিস্ট বাম্পটা!”

“আমি নিজেও এটা শিখেছি মাত্র কয়েকদিন হলো, বাচ্চারা আমাকে শিখিয়েছে! হাই ফাইভও জায়গা মতো দেব।”

শওকত সাহেব বললেন, “শুরুটা খুব ভালো হয়েছে। এখন চালিয়ে যাও।”

ফারিহা বলল, “এটা ডিটেকটিভ কাজ হচ্ছে নাকি টিভি সিরিয়াল হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না!”

শওকত সাহেব বললেন, “দুটোই, এটা হচ্ছে ডিটেকটিভ কাজের সিরিয়াল।”

শওকত সাহেব শাহরিয়ার এবং ফারিহাকে নিয়ে তার অফিস থেকে বের হলেন। করিডোর ধরে হেঁটে হেঁটে অফিসের বিভিন্ন অংশ দেখাতে দেখাতে এক পাশে চলে এসে একটা ঘরের সামনে

থামলেন। দরজা থেকে চাবি ঝুলছে, চাবিটা বের করে শাহরিয়ারের হাতে দিয়ে বললেন, " তোমার অফিসের চাবি।"

শাহরিয়ার বলল, "থ্যাংক ইউ। কাজ শুরু করার আগেই অফিসের চাবি পেয়ে গেলাম।"

"তুমি টের পাচ্ছ না কিন্তু আসলে তুমি কাজ শুরু করে দিয়েছ শাহরিয়ার।"

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে ছোটাচ্চু মুগ্ধ হয়ে গেল। বড় একটা রুম, মাঝখানে সেক্রেটারিয়েট টেবিল, দামি চেয়ার, জানালা থেকে ভারী পর্দা ঝুলছে। টেবিলের উপর একটা দামি ল্যাপটপ। পিছনে ফাইল কেবিনেট, একটা শেলফ, একপাশে একটা দরজা। ছোটাচ্চু দরজা খুলে দেখল একটা সুন্দর বাথরুম। সে অবাক হয়ে শওকত সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "এটা আমার অফিস?"

"হ্যাঁ। পছন্দ হয়েছে?"

"পছন্দ হবে না মানে? মনে হচ্ছে একটা স্লিপিং ব্যাগ কিনে এনে এখানে থাকা শুরু করি!"

"মোস্ট ওয়েলকাম। করতেই পার।"

ফারিহা অফিসটা ঘুরে একটু দেখে বলল, "এতো সুন্দর অফিসে শাহরিয়ারকে মোটেও মানাবে না!"

ছোটাচ্চু বলল, "তুমি বুঝতে পারছ না সেটাই হচ্ছে মূল আইডিয়া! যত বেমানান তত ভালো।"

ফারিহা ঘড়িটা দেখে বলল, "আমি এখন তাহলে যাই? দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

শওকত সাহেব বললেন, "চল, আমি তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।" ফারিহা বলল, "কোনো প্রয়োজন নেই। আমি চলে যেতে পারব। ছোটাচ্চু তার দুমড়ানো মোচড়ানো ব্যাকপেকটা টেবিলের উপর রেখে তার চেয়ারে বসল। শওকত সাহেব বললেন, "তুমি তোমার অফিসে একটু অভ্যস্ত হয়ে নাও আমি একটু পরে তোমাকে আমাদের কনফারেন্স রুমে নিয়ে যাব। সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব।"

"ঠিক আছে।"

সন্ধেবেলা যখন সবাই দাদির (কিংবা নানির) রুমে বসে হুটোপুটি করছে এবং দাদি একটু পরে পরে ধমক দিয়ে সবাইকে চুপ করার কথা বলছেন তখন ছোটাচ্চু কয়েকটা কেকের বাক্স নিয়ে ঢুকলো। একসাথে সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, একজন জিজ্ঞেস করল, "কী এনেছ ছোটাচ্চু?"

আরেকজন বলল, "ছোটাচ্চু তুমি তো খাবার দাবার আনতে ভুলেই গিয়েছিলে! শেষ পর্যন্ত আবার এনেছ?"

আরেকজন বলল, "হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? দাও, খাই।"

আরেকজন বলল, "রাক্ষসের মতো খিদে পেয়েছে।"

আরেকজন সুর করে বলল, "হাউ মাউ খাউ, খাবারের গন্ধ পাউ।"

শুধু দাদি চোখ কপালে তুলে বললেন, "শাহরিয়ার তোর এ কী চেহারা হয়েছে জংলীর মতন? ডাকাতের মতো দাড়ি? চুল

আঁচড়াসনি, ময়লা একটা টি-শার্ট পরেছিস? ছেঁড়া প্যান্ট? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তোর হয়েছেটা কী?“

ছোটাচ্চু বলল, “বড় একটা কোম্পানির বড় একটা কাজ করে দিচ্ছি তো, এটা হচ্ছে সেই কোম্পানির পোশাক!”

দাদি (কিংবা নানি) রেগে উঠলেন, বললেন, “আমার সাথে ইয়ারকি করিস? দেবো একটা থাপ্পড়।”

শান্ত বলল, “দাদি, তুমি বুঝতে পারছ না, ছোটাচ্চুর এই পোশাক হচ্ছে আজকালকার মডার্ন পোশাক!”

দাদি দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, “চুলোয় যাক মডার্ন পোশাক! এই যদি মডার্ন পোশাকের অবস্থা হয় তাহলে মডার্ন হওয়ার কোনো দরকার নাই।”

মুনিয়া বলল, “দাদি, আমরা ছোটাচ্চু কী এনেছে সেটা খেতে খেতে কথা বলি?”

দাদি গজগজ করতে লাগলেন। ছোটাচ্চু দাদির দিকে তাকিয়ে হা হা করে হাসতে হাসতে বলল, “মা, তুমি যদি চাও, তাহলে কেন এই পোশাক পরেছি, এই চেহারা করেছি বলতে পারি–”

“কোনো দরকার নাই, ভদ্র কাপড় পরে আয় তাহলেই হবে!”

“ঠিক আছে, আগে বাচ্চাদের কেকগুলো দিয়ে যাই।”

একজন জানতে চাইল, “কী কেক ছোটাচ্চু?”

“এটা হচ্ছে চীজ কেক। একটা বেহেশতি খাবার। তোরা যদি বেহেশতে যাস তাহলে বেহেশতের দরজায় এই কেকের একটা টুকরা খেতে দেবে, তোরা সেটা খেতে খেতে ভিতরে ঢুকবি।”

প্রমি বলল, “শান্ত তুই বেশি করে খেয়ে নে। তুই তো পরকালে এই কেক খাওয়ার সুযোগ পাবি না!”

প্রমির কথা শুনে সবাই হি হি করে হাসতে লাগল।

ছোটাচ্চু কেকের বাক্সগুলো নিচে রাখল এবং সব বাচ্চারা কেকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ছোটাচ্চু যখন তার ঘরে গিয়েছে তখন টুনিও তার পিছনে পিছনে এসেছে। ছোটাচ্চু টুনিকে দেখে বলল, “কিছু বলবি?”

“হ্যাঁ।”

“তাড়াতাড়ি বল, আমার গোসল করতে হবে।”

“তুমি বলেছ যে বড় একটা কোম্পানির কাজ করে দিচ্ছ। কী কাজ? “

“ময়লা টি-শার্ট পরে একটা হাইফাই অফিসে টেবিলের উপর পা তুলে বসে থাকা।“

“ঠাট্টা করো না ছোটাচ্চু, সত্যি সত্যি বল।

ছোটাচ্চু বলল, “আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না। মাঝে মাঝে একজন সিনিয়র মানুষকে মুখ গম্ভীর করে বলেছি, আপনি আমার রুমে একটু আসেন। মানুষটা তার সব কাজ ফেলে দিয়ে

মুখ কাঁচুমাচু করে চলে এসেছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি।"

"কী জিজ্ঞাসাবাদ করেছ?"

"বউ বাচ্চা কী করে। প্রিয় লেখক কে? এই সব–"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "ছোটাচ্চু তোমার কথার কোনো মাথামুণ্ডু নাই। এসব কাজ করার জন্য কোনো কোম্পানি কাউকে ডাকে না।"

ছোটাচ্চু বুকে টোকা দিয়ে নাটকের ডায়ালগের ভঙ্গীতে গলা কাঁপিয়ে বলল, "এই বান্দাকে ডাকে। কারণ আমি যদু মধু না, আমি হচ্ছি বিখ্যাত তরুণ ডিটেকটিভ মিস্টার শাহরিয়ার! যার উপস্থিতিতে চোর-ডাকাত- ষড়যন্ত্রকারীরা থরথর করে কাঁপে-"

টুনি এবারে কাতর গলায় বলল, "ছোটাচ্চু প্লিজ প্লিজ তুমি ঠিক করে বল তোমাকে কেন এত টাকা ফি দিয়ে নিয়েছে, তোমার কী করতে হয়? তুমি কী করবে? প্লিজ প্লিজ–"

ছোটাচ্চুর তখন টুনির জন্য মায়া হলো। তাই শওকত সাহেব কেন তাকে তার কোম্পানিতে নিয়েছেন, তার কী করতে হবে সেটা অল্প কথায় বুঝিয়ে দিল। শুনে টুনি খুশিতে হাততালি দিয়ে বলল, "বাহ কী মজা! খালি তোমার চেহারা দেখিয়েই কাজ হয়ে যাবে?"

"শওকত সাহেব তো তাই মনে করেন।"

টুনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, "কিন্তু তুমি যদি আসলেই তার কোম্পানির দুই নম্বুরি মানুষগুলোকে ধরে ফেল তাহলে আরো মজা হবে, তাই না?"

"হবে। কিন্তু দরকার কী? দুই নম্বুরি মানুষ যদি ভয় পেয়ে দুই নম্বুরি কাজ না করে তাহলেই তো হলো!"

টুনি বলল, "তা ঠিক। কিন্তু–" টুনি থেমে গিয়ে কিছু একটা চিন্তা করতে লাগল।

ছোটাচ্চু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু কী?"

"ছোটাচ্চু তুমি কী জান, গোপন কথাগুলো দুই নম্বুরি মানুষেরা কেমন করে জানে?"

ছোটাচ্চু মুখ গম্ভীর করে বলল, "তার উপায় হচ্ছে তিনটা। কথাবার্তা গোপনে শোনা, কম্পিউটার থেকে জানা আর কাগজপত্র কিংবা ফাইল থেকে জানা। কথাবার্তা গোপনে শুনতে হলে গোপন মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে হবে, কম্পিউটারে দেখতে হলে হ্যাঁক করতে হবে, কাজেই সোজা পদ্ধতি হচ্ছে ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি।

টুনি মাথা নাড়ল। তারপর কিছু একটা চিন্তা করতে লাগল। চিন্তা করতে করতেই সে ছোটাচ্চুর ঘর থেকে বের হয়ে এল।

.

শওকত সাহেবের অফিসে কাজ করতে শুরু করার পর ছোটাচ্চু মাঝে মাঝেই বাচ্চাদের জন্য খাবার-দাবার নিয়ে আসতে থাকলো। সেটা নিয়ে বাচ্চাদের মধ্যে অনেক আনন্দ কিন্তু দাদি (কিংবা নানি) প্রত্যেকবার ছোটাচ্চুকে দেখেন আর রেগে ওঠেন!

ছোটাচ্চু মনে হয় তার মাকে রাগিয়ে এক ধরনের আনন্দ পেতে শুরু করেছে। চুল যতখানি এলোমেলো হলেই কাজ চলে যায় ইচ্ছে করে তার থেকে বেশি এলোমেলো করে রাখে! দাদির কাছে যাওয়ার আগে জামা কাপড় বদলে এলেই অনেক সমস্যা মিটে যায় কিন্তু ছোটাচ্চু সেটা করার চেষ্টা করে না। দাদি (বা নানি) যত রেগে চেঁচামেচি করেন ছোটাচ্চু তত জোরে হা হা করে হাসে!

টুনি প্রায় প্রত্যেকদিনই ছোটাচ্চুর কাছ থেকে খুঁটিনাটি খবর নেয়। তার থেকে খবর নিতে নিতে শওকত সাহেবের অফিসের অনেককেই সে চিনতে শুরু করেছে। নিচ তলার গার্ড নাকি সবসময় মিলিটারি কায়দায় সেল্যুট দেয় এবং তার চেহারাও মেজর জেনারেলের মতো। রিসেপশনিস্ট মেয়েটির হাসির রোগ আছে এবং সব সময় হি হি করে হাসছে। শওকত সাহেবের পার্সোনাল সেক্রেটারি সব সময় প্রমিত বাংলায় কথা বলে, বেশির ভাগ শব্দ নাক দিয়ে উচ্চারণ করে। একাউন্টেট 'প' উচ্চারণ করতে পারে না 'প্রথম'কে বলে 'ফ্রতম'। সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার একজন মহিলা, কখনও কথা বলে না, কিছু জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দেয় না। স্টোর কিপারের চেহারা রাসপুটিনের মতো। কাজেই ছোটাচ্চু যখন অফিসের গল্প করে তখন টুনি তাদের চিনতে কোনো ভুল করে না।

তবে এই মানুষগুলো অফিসের মানুষ, তারা দুই নম্বুরি হলেও শতকত সাহেবের বিজনেসের জন্যে বিপজ্জনক নয়। তার বিজনেসের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে সবচেয়ে সিনিয়র কয়েকজন অফিসার। শওকত সাহেবের সাথে আলাপ আলোচনা করে সেরকম ছয়জন পাওয়া গেছে। টুনি এখন তাদের কথাও জেনে গেছে, তবে তাদের আসল নাম সে জানে না।

ছোটাচ্চু তাদেরকে যে নাম দিয়েছে সেই নাম দিয়ে চিনে। তারা হচ্ছে :

মি. নাদুস নুদুস : মানুষটা মনে হয় একটু মোটাসোটা সেইজন্য এই নাম! ছোটাচ্চু দাবি করে এই মানুষটা যখন হাসে তখন তার ভুঁড়িটা উপরে নিচে নাচে। এটা সত্যি সম্ভব কিনা টুনি জানে না, কিন্তু ছোটাচ্চু দাবি করেছে এটা সত্যি!

মি. চিকন-চাকন : একজন মিস্টার নাদুস নুদুস থাকলে একজন মিস্টার চিকন-চাকন থাকতেই হবে। তাই ছোটাচ্চু এই মানুষটাকে এই নামে ডাকে। মানুষটা আসলেই চিকন- চাকন কিনা টুনি জানে না, হয়তো মিস্টার নাদুস নুদুসের পাশে তাকে একটু শুকনো দেখায়।

খালাম্মা : খালাম্মাদের আলাদা কোনো চেহারা হয় কিনা কে জানে? টুনি অনেক কম বয়সী টিশটাশ খালা দেখেছে কিন্তু কোনো মহিলার বয়স একটু বেশি হলেই মনে হয় ছোটাচ্চু তাকে খালাম্মা ডাকে!

মি. ইটিস-মিটিস : এই মানুষটা নাকি সব সময় মুখ বাঁকা করে ইংরেজিতে কথা বলে। তাই তার নাম দেওয়া হয়েছে মিস্টার ইটিস-মিটিস। বাংলাতে যখন কথা বলে তখনও সেটাকে নাকি ইংরেজির মতো শোনায়!

মি. এলার্জি ম্যান : এই মানুষটা নাকি সব সময় হাঁচি দেয়, টিস্যু দিয়ে নাক মুছতে থাকে। তার হাতে নাকি সব সময় একটা টিস্যুর বাক্স থাকে। টিস্যু দিয়ে সব সময় ঘঁষাঘষির কারণে তার নাক নাকি টমেটোর মতো লাল হয়ে থাকে, তাই ছোটাচ্চু তার নাম দিয়েছে মিস্টার এলার্জি ম্যান!

মি. সিরিয়াল কিলার : ছোটাচ্চু দাবি করে এই মানুষটার চেহারা নাকি সিরিয়াল কিলারের মতো। টুনি তার আম্মুর ইংরেজি সাইকোলজির বইয়ে অনেকগুলো সিরিয়াল কিলারের ছবি দেখেছিল। চেহারা দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে তারা সিরিয়াল কিলার। তাদের সবার হাসিখুশি ভালো মানুষের মতো চেহারা! কাজেই একজন মানুষের চেহারা কেমন করে সিরিয়াল কিলারের মতো হয় টুনি সেটা ছোটাচ্চুকে জিজ্ঞেস করেছিল। ছোটাচ্চু বলেছিল কোটরের ভিতরে ছোট ছোট চোখ, উঁচু চোয়াল আর চিকন ঠোঁট। মুখে কোনো হাসি নেই, তাকালেই নাকি ভয় লাগে।

কাজেই ছোটাচ্চুর কাছে টুনি এই মানুষগুলোর গল্প শোনে। কোনটা বিশ্বাস করবে কোনটা বিশ্বাস করবে না বুঝতে পারবে না। কারণ ছোটাচ্চুর গল্পগুলো হয় এরকম : "বুঝলি টুনি আজকে কী হয়েছে? আমি আমার অফিসে বসে কাজ করছি, টেবিলের উপর পা তুলে রেখেছি তখন হঠাৎ করে আমার অফিসে সিরিয়াল কিলার এসে ঢুকল। হাত পিছনে, আমি একেবারে শিওর ছিলাম সেই হাতে একটা পিস্তল। এক্ষুণি সেটা বের করে আমার মাথায় গুলি করবে দুম দুম দুম–আমি নিজেকে বাঁচানোর জন্য টেবিলের তলায় একটা ডাইভ প্রায় দিয়েই দিয়েছিলাম তখন সিরিয়াল কিলার বলল—"

টুনি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কী বলল?"

"বলল গুড মরনিং শাহরিয়ার সাহেব। "

"ব্যস? আর কিছু না?"

"নাহ। আর কিছু না।"

গল্পের কোনো মাথা মুণ্ডু নেই। একদিন ছোটাচ্চু বলল, “আজকে খালাম্মা অফিসে আমাকে একটা ঝাড়ি দিল!”

টুনি বলল, “ঝাড়ি দিল? খালাম্মা?”

“হ্যাঁ।”

“কী বলে ঝাড়ি দিয়েছে?”

“আমার অফিসে এসে বলেছে, এতো গরম পড়েছে আপনি এসি চালাচ্ছেন না কেন? “

“এইটা ঝাড়ি?”

“অফ কোর্স এইটা ঝাড়ি। আমার ব্যক্তিগত কাজকর্মে আরেকজন কথা বলবে কেন?”

টুনি জিজ্ঞেস করল, “তুমি কী বলেছ?”

“আমি কিছু বলি নাই, এসিটা চালু করে দিয়েছি। তারপর খালাম্মা চলে গেলে আবার এসি বন্ধ করে দিয়েছি।”

টুনি এই গল্পেরও কোনো মাথামুণ্ডু বুঝতে পারল না। তারপর একদিন ছোটাচ্চু বলল, “আজকে করিডোরে মিস্টার ইটিস-মিটিসের সাথে দেখা।”

টুনির পরের অংশটা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ছোটাচ্চু আর কিছু বলল না দেখে টুনি নিজেই জিজ্ঞেস করল, “তারপর?”

“ইটিস-মিটিস বলল ইটিস মিটিস কিটিস চিটিস…”

“মানে?”

“মানে জানি না।”

“তখন তুমি কী করলে?”

ছোটাচ্চু বলল, “আমি বললাম কিটিস মিটিস টিটিস ফিটিস..”

“তার মানে?

“জানি না!”

টুনি হা করে তাকিয়ে রইল। ছোটাচ্চুর গল্পগুলো তার মতোই মাথামুণ্ডুহীন!

.

দুদিন পর টুনি ছোটাচ্চুর ঘরে গিয়ে তাকে একটা ছোট শিশি দিয়ে বলল, ছোটাচ্চু, “এইটা আমি তোমার জন্য রেডি করেছি।”

ছোটাচ্চু শিশিটা হাতে নিয়ে বলল, “এইটা কী?’

“মশা।”

ছোটাচ্চু অবাক হয়ে দেখল শিশিটার তলায় সত্যি সত্যি বেশ কিছু মশা মরে পড়ে আছে। অবাক হয়ে বলল, “মশা? মশা কী জন্য?”

“মনে আছে তুমি বলেছিলেন দুই নম্বুরি মানুষেরা গোপন খবরগুলো পায় ফাইল থেকে?”

“হ্যাঁ। মনে আছে।”

টুনি বলল, “এটা সত্যি কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য এই মশা।”

“মশা দিয়ে কীভাবে পরীক্ষা করা হবে?”

“তুমি ফাইলের ভেতরে পয়লা পৃষ্ঠায় কয়েকটা মশা দিয়ে রাখবে। কেউ ফাইল খুলে নাড়াচাড়া করলে মশা নিচে পড়ে যাবে। তাই তুমি পরে ফাইল খুলে দেখবে মশা আছে নাকি নেই। যদি না থাকে তাহলে বুঝতে পারবে কেউ ফাইল খুলে নাড়াচাড়া করেছে।”

ছোটাচ্চু চোখ বড় বড় করে বলল, “তোর ধারণা এটা কাজ করবে?”

“কেন করবে না? চেষ্টা করে দেখ। শুধু শওকত সাহেবকে আগে থেকে বলে রেখো, ফাইলগুলো খোলার সময় যেন সাবধানে খুলেন, মশাগুলো যেন আবার আগের মতো রেখে দেন।“

.

পরের দিন ছোটাচ্চু শওকত সাহেবের অফিসে গেল একটা শার্ট পরে তবে তার গলায় একটা টকটকে লাল গামছা ঝুলছে। তাকে দেখে গার্ড একটু হকচকিয়ে গেলেও বিশাল বড় একটা সেল্যুট দিল। রিসেপসনিস্ট মেয়েটি তার অভ্যাস মতো হি হি করে হাসতে লাগল। শাহরিয়ার বলল, কেন?”

মেয়েটি এই কয়দিনে শাহরিয়ারের সাথে অনেক সহজ হয়েছে। হাসি থামিয়ে বলল, “গামছাটা আপনাকে অনেক মানিয়েছে।”

ছোটাচ্চু বলল, “শুধু তোমাদের শাড়ির আঁচল থাকবে, ওড়না থাকবে আর আমাদের কিছু থাকবে না এটা হতে পারে না। এটা আমাদের গ্রামবাংলার ঐতিহ্য।”

করিডোরে সিরিয়াল কিলারের সাথে দেখা হলো, সে কিছু না বলে সরু চোখে তাকিয়ে রইল। ছোটাচ্চু থেমে গিয়ে বলল, “কিছু বলবেন?”

সিরিয়াল কিলার বলল, “আপনার গামছার রংটা খুব সুন্দর।

ছোটাচ্চু বলল, “আপনার টাইয়ের রংটাও সুন্দর।”

সিরিয়াল কিলার বলল, “থ্যাংক ইউ।” তারপর হেঁটে চলে গেল।

যখন শওকত সাহেবের রুমে কেউ নেই তখন ছোটাচ্চু তার অফিসে গেল। শওকত সাহেব হাসি হাসি মুখে বললেন, “তোমার নতুন পোশাকে খুব মানিয়েছে শাহরিয়ার। গুড আইডিয়া।“

“থ্যাংক ইউ। কিন্তু আইডিয়ায় টানাটানি পড়ে যাচ্ছে।”

“সমস্যা নেই। এক আইডিয়া অনেকদিন চালানো যায়।”

হাতের কাগজটা টেবিলে রেখে বললেন, “কিছু বলবে।”

“জী।“

“বস। বসে বল।”

ছোটাচ্চু মুখ গম্ভীর করে বলল, “আপনার গোপন তথ্য বের হওয়ার যে পথগুলো আছে সেগুলো এখন একটা একটা করে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। শুরু করব ফাইল দিয়ে।”

শওকত সাহেব বললেন, "ভেরি গুড।"

ছোটাচ্চু পকেট থেকে টুনির দেওয়া শিশিটা বের করে বলল, "ফাইলের মাঝে সেনসিটিভ ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস লাগানো যায় কিন্তু আমি তার বদলে চেষ্টা করতে চাই দেশীয় প্রযুক্তি। মশা।"

শওকত সাহেব চোখ কপালে তুলে বললেন, "মশা?"

"জী।" ছোটাচ্চু শিশিটা দেখিয়ে বলল, "অনেকগুলো মশা মেরে এই শিশিতে করে নিয়ে এসেছি। আপনার যতগুলো গোপন ফাইল আছে আমি সেই ফাইলগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় কয়েকটা করে মশা দিয়ে রাখব। যদি কেউ ফাইলগুলো নাড়াচড়া করে তাহলে মশাগুলো পড়ে যাবে। আমরা বুঝব কেউ না কেউ ফাইল খুলেছে–"

শওকত সাহেব বললেন, "কিন্তু আমি নিজেই মাঝে মাঝে ফাইলগুলো খুলি। মাঝে মাঝে বাসাতেও নিই।"

আপনি যেহেতু জানেন তাই ফাইলগুলো খুব সাবধানে খুলবেন। বন্ধ করার সময় মশাগুলো আগের জায়গায় রেখে তারপর ফাইলটা বন্ধ করবেন।"

"ঠিক আছে শাহরিয়ার। আমি চেষ্টা করব তোমার মূল্যবান মশাগুলো রক্ষা করে ফাইলগুলো খুলতে এবং বন্ধ করতে!"

"এখন তাহলে আপনার গোপন ফাইলগুলো বের করেন, আমরা মশা দিয়ে রেডি করে নিই।

শওকত সাহেব চাবি বের করে তার ফাইল কেবিনেট খুলে অনেকগুলো ফাইল বের করলেন, বেশির ভাগ ফাইলের উপর

লেখা গোপনীয়। অনেকগুলো ফাইলের ভেতর থেকে গোপনীয় লেখা লাল স্টিকার বের হয়ে আছে। ছোটাচ্চু আর শওকত সাহেব মিলে ফাইলের গোপনীয় অংশগুলো বের করে সেখানে গুণে গুণে পাঁচটা মশা রেখে ফাইল বন্ধ করে দিতে লাগলেন। তারপর সবগুলো আবার ফাইল কেবিনেটে রেখে সেটা তালা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ছোটাচ্চু বাসায় তার লাল গামছা গলায় বাচ্চাদের সাথে কথা বলছিল। বাচ্চারা সবাই গামছাটা পছন্দ করেছে এবং ছোটাচ্চুকে অনুরোধ করেছে তাদের সবাইকে একটা করে গামছা কিনে দেওয়ার জন্য। ছোটাচ্চু রাজি হয়েছে কিন্তু বলেছে তার আগে সবার বাবা মায়ের কাছ থেকে লিখিত চিঠি আনতে হবে যে এ ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি নেই।

দাদি তার সিরিয়াল দেখার ফাঁকে এই কথাটা শুনে ফেলে রেগে উঠলেন, বললেন, "বাচ্চাদের সবার চিঠি আনতে হবে? আর তুই গলায় গামছা দেওয়ার আগে আমার কাছ থেকে চিঠি নিয়েছিস?"

ছোটাচ্চু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমি তো বড় হয়ে গেছি!"

দাদি (কিংবা নানি) আরো রেগে উঠলেন, বললেন, "তুই বড় হয়ে গেছিস? আমাকে সেই কথা বিশ্বাস করতে বলিস?"

ছোটাচ্চু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখন তার টেলিফোনটা বেজে উঠল। ছোটাচ্চু দেখল শওকত সাহেব ফোন করেছেন। এতো রাতে শওকত সাহেব কেন ফোন করেছেন ছোটাচ্চু অনুমান করতে পারল না। টেলিফোনটা কানে লাগিয়ে সে কথা বলার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বলল, "হ্যালো"

ছোটাচ্চু শুনল শওকত সাহেব উত্তেজিত গলায় বলছেন, "তুমি বিশ্বাস করবে না কী হয়েছে।"

"কী হয়েছে?"

"কাল পরশু ছুটি দেখে আমি আমার পাঁচটা ফাইল বাসায় এনেছি। সবগুলো গোপন ফাইল। গাড়ি থেকে নামার সময় আমি একটা ফাইল হাতে করে নিয়ে ড্রাইভারকে বলেছি বাকি ফাইলগুলো নামিয়ে নিতে। ড্রাইভার বলেছে সে গাড়িটা গ্যারাজে রেখে ফাইলগুলো নিয়ে আসছে। তারপর কী হয়েছে জান?"

ছোটাচ্চু বলল, "কী হয়েছে?

শওকত সাহেব উত্তেজিত গলায় বললেন, "যে ফাইলটা আমি হাতে করে এনেছি সেটার ভেতর মশাগুলো আছে। পাঁচটাই। আর ড্রাইভার যেগুলো নামিয়েছে তার ভেতর কোনো মশা নেই, একটার ভেতরে শুধু একটা আধমরা মশা ঝুলে আছে।"

"তার মানে? ড্রাইভার?"

"হ্যাঁ। আমার ড্রাইভার হচ্ছে ঘরের শত্রু বিভীষণ। সে ফাইলগুলো খুলে দেখেছে! কিন্তু এই ড্রাইভার লেখাপড়া জানে না, ফাইল দেখে সে কী বুঝবে?"

ছোটাচ্চু বলল, "আপনি বুঝতে পারছেন না? তার কাছে নিশ্চয়ই ভালো ক্যামেরা আছে! সে ঝটপট ছবি তুলে নিয়েছে, অন্য কাউকে সে ছবিগুলো পাঠায়!"

শওকত সাহেব চিৎকার করে বললেন, "ইয়েস! আমি দেখেছি তার কাছে মহা দামি মোবাইল। আমি তখনই তাকে জিজ্ঞেস

করেছি এতো দামি মোবাইল দিয়ে তুমি কী কর? সে অ্যাঁ অ্যাঁ করে কথা ঘুরিয়ে ফেলল। ব্যাটা বদমাইশ। আমার টাকায় সে আমার সাথে দুই নম্বুরি? ডি.এম.পি. কমিশনার আমার বন্ধু– আমি এক্ষুণি তাকে ফোন করছি– ধরে নিয়ে যাক–"

ছোটাচ্চু হা হা করে উঠল, বলল, "না, না, না–ড্রাইভার ইম্পরট্যান্ট না, তাকে যে ব্যবহার করছে সে হচ্ছে ইম্পরট্যান্ট!"

"ড্রাইভারকে ধরে কেঁচকি দিলে সব বের হয়ে যাবে–

ছোটাচ্চু বলল, "না, না–আপনি কিছু করবেন না। এমন ভান করেন যে কিছুই হয়নি। কেউ যেন কিছু সন্দেহ না করে। প্রথম স্টেপ শেষ হয়েছে এখন সেকেন্ড স্টেপ!"

শওকত সাহেবের মনে হলো একটু মন খারাপ হলো, বললেন, "কিছু করব না? ডেকে ধমকও দিতে পারব না?"

"না না। আসল ক্রিমিনালকে সাবধান হতে দেবেন না। কেউ যেন কিছু সন্দেহ না করে

শওকত সাহেব মনমরা হয়ে বললেন, "ঠিক আছে! তুমি যদি তাই বল। তুমি হচ্ছ ডিটেকটিভ!"

ছোটাচ্চু ফোন পকেটে রেখে দাদির ঘরে গেল। শান্ত তার ডান পা'টা ঘাড়ের উপরে তোলার চেষ্টা করছে। অন্যেরা তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। ছোটাচ্চু চোখ কপালে তুলে বলল, "কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এখানে?"

টুম্পা বলল, "যোগ ব্যায়াম।"

ছোটাচ্চু ধমক দিয়ে বলল, "এটা কী রকম যোগ ব্যায়াম?"

শান্ত বলল, “এটার নাম কর্কট আসন। এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আরেকটা পা ঘাড়ের উপর তুলতে হয়।”

ঝুমু খালা দাদির পায়ের কাছে বসে দাদির (কিংবা নানির) সাথে সিরিয়াল দেখছিল, এবারে বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে বলল, “ঘাড়ের উপর ঠ্যাং তোলা ঠিক না। আমাগো গ্রামে একজন একবার তার ঠ্যাং ঘাড়ে তুলেছিল তারপর আর নামাতে পারে নাই। “

টুম্পা জিজ্ঞেস করল, “তারপর কী হয়েছে?”

“ঐ রকমই আছে।”

“ঐ রকমই আছে?”

ঝুমু খালা মাথা নাড়ল। বলল, “এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। এক পা ঘাড়ে নিয়েই থাকে, অন্য পা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলাচল করে। লোকজন দেখতে আসে। ভালো ইনকাম। বিয়ে-শাদী করেছে। বাচ্চা কাচ্চা আছে।“

ঝুমু খালার কথা শুনে বাচ্চা-কাচ্চারা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে থাকে। ঝুমু খালা বলল, “কী হলো? আমার কথা বিশ্বাস হলো না? চল আমাগো গ্রামে।”

ছোটাচ্চু বলল, “থাক! এখন কারো ঘাড়ে ঠ্যাং তোলার দরকার নাই আর কারো গ্রামে যাওয়ারও দরকার নাই!” তারপর টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, “টুনি, তোর খেলা শেষ হলে আমার রুমে একবার আসিস।”

সব বাচ্চা তখন জানতে চাইল, “কেন? কেন টুনি একা তোমার রুমে যাবে? আমরা কেন যেতে পারব না?”

ছোটাচ্চু বলল, “ঠিক আছে, চাইলে তোরাও আসিস।”

ছোটাচ্চু তখন পুরো বাচ্চাদের দলকে নিয়ে নিজের রুমে রওনা দিল। ঝুমু খালা বলল, “শেষ পর্যন্ত একটু শান্তিমতো সিরিয়ালটা দেখতে পারমু। এই পোলাপানের ক্যাচম্যাচ ক্যাচমেচের যন্ত্রণায় একটা জরুরি কাম পর্যন্ত করতে পারি না।”

ছোটাচ্চুর ঘরে যাবার পর ছোটাচ্চু তার চেয়ারে পা তুলে বসল। বাচ্চারা কেউ বিছানায়, কেউ দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ছোটাচ্চু গলা খাকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, “তোরা সবাই জানিস শওকত সাহেব তার ফার্মে আমাকে সিকিউরিটি কনসালটেন্ট হিসেবে রেখেছেন। তার ফার্মে কিছু বড় সমস্যা হচ্ছিল, গোপন তথ্য পাচার হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত একটা মেজর ব্রেকথ্রু হয়েছে। কীভাবে গোপন তথ্য পাচার হয়ে যাচ্ছে সেটা ধরা গেছে।”

বাচ্চারা চিৎকার করে বলল, “ইয়া ইয়া ইয়াহু ... জয় জয় ছোটাচ্চুর জয় ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক–”

ছোটাচ্চু একটু ইতস্তত করে বলল, “বুদ্ধিটা অবশ্য টুনির, টুনি খুব সুন্দর একটা আইডিয়া দিয়েছিল মশা দিয়ে।”

বাচ্চারা আবার চিৎকার করল। “জয় জয় টুনি আপুর জয়, জয় জয় মশার জয়-ধ্বংস হোক ধ্বংস হোক–”

কে ধ্বংস হোক কেন ধ্বংস হোক সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না। চিৎকার করলেই শেষে 'ধ্বংস হোক' বলা সবার অভ্যাস হয়ে গেছে, ভালো হোক খারাপ হোক সেটা বিষয় নয়।

মশা দিয়ে কীভাবে শওকত সাহেবের ড্রাইভারকে ধরা হয়েছে ছোটাচ্চু সবাইকে তার কাহিনী বলল। এখনও যে আসল মানুষকে ধরা হয় নাই সেটাও সবাই জেনে গেল। বাচ্চারা তখন চেঁচামেচি শুরু করল, সবার আগে সবচেয়ে গলা উঁচিয়ে কথা বলল শান্ত, "ছোটাচ্চু তুমি এখনো বসে আছে কেন? ড্রাইভারকে ধরে আন? হুমকি ধামকি দাও। তুমি যদি না পার আমাকে বল, আমি খুব ভালো হুমকি ধামকি দিতে পারি। সেইদিন রাস্তায়–" শান্ত হঠাৎ করে থেমে গেল।

"রাস্তায় কী?"

শান্ত উদাস মুখে বলল, "না, কিছু না।"

বোঝা গেল সেইদিন রাস্তায় শান্ত যে ঘটনাটা ঘটিয়েছে সেটা সবার সামনে বলার মতো না।

বাচ্চাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট হচ্ছে মুনিয়া। সে বলল, "হুমকি ধামকিতে কাজ হবে না। বাঁশ ডলা দিতে হবে, বাঁশ ডলা দিলে সবকিছু বলে দিবে।"

"বাঁশ ডলা কীভাবে দেয়?"

"জানি না।"

"তাহলে?"

“ঝুমা খালার কাছে শুনেছি। ঝুমু খালার গ্রামে কারো কাছ থেকে কথা বের করতে হলে তাকে বাঁশ ডলা দেয়।”

ছোটাচ্চু হতাশভাবে মাথা নাড়ল, বলল, “ঝুমু কী বলে না বলে তার কোনো মাথামুণ্ডু নাই। “

প্রমি বলল, “পুলিশ দিতে ঝামেলা কী? পুলিশ বের করে নিবে শাহানা বলল, “লাই ডিটেক্টর লাগিয়ে দুই একটা প্রশ্ন করলেই তো হয়। কোর্ট অবশ্য এটা মানবে না—”

আরো অনেক রকম আলোচনা এবং অনেক রকম উপদেশ দিয়ে সবাই চলে গেল। যাওয়ার আগে এক বিষয়ে সবাই একমত হলো, ছোটাচ্চু যে টাকাটা পাচ্ছে তার অর্ধেক টুনিকে দিতে হবে। টুনিকে বলা হলো, এতো টাকা দিয়ে সে কী করবে? সেটা সে সব বাচ্চাদের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দিতে পারে।

পুরো সময়টাতে টুনি কোনো কথা বলেনি। সবাই চলে গেলে টুনি বলল, “তুমি যে শওকত সাহেবকে বলেছ ব্যাপারটা গোপন রাখতে, কেউ যেন কিছু সন্দেহ না করে সেটা খুবই ভালো একটা কাজ হয়েছে।

ছোটাচ্চু বলল, “তাড়াহুড়া করার কোনো দরকার নেই।”

টুনি বলল, “হ্যাঁ। তাছাড়া বিষয়টা এখনো ঠিকভাবে প্রমাণ হয় নাই। এমনও তো হতে পারে ড্রাইভার ফাইলগুলো নেওয়ার সময় খাড়াভাবে ধরে নিয়েছে। ঝাঁকাঝাঁকি করেছে তাই মশাগুলো পড়ে গেছে, আসলে সে নির্দোষ তাই ব্যাপারটা আরো ঠিকভাবে পরীক্ষা করতে হবে।”

ছোটাচ্চু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল, বলল, "আমিও তাই ভাবছিলাম।"

ছোটাচ্চুর মুখে দেখে অবশ্য বোঝা গেল ছোটাচ্চু আসলে মোটেও সেটা ভাবছিল না কিন্তু টুনি সেটা বলল না। টুনি বলল, "আমার কী মনে হয় জান ছোটাচ্চু, এখন খারাপ মানুষটাকে ফাঁদে ফেলতে হবে।"

ছোটাচ্চু বলল, "ফাঁদ। ইয়েস। কঠিন ফাঁদে ফেলতে হবে।"

"কীভাবে ফাঁদে ফেলা যায় চিন্তা করেছ?"

"এখনও চিন্তা করি নাই। চিন্তা করতে হবে। তুই কিছু চিন্তা করেছিস?"

টুনি বলল, "আমি একটা চিন্তা করেছিলাম-

ছোটাচ্চু আগ্রহ নিয়ে বলল, "কী চিন্তা করছিলি?"

"মনে করো শওকত সাহেব একটা গোপন ফাইল বাসায় নিয়ে গেছেন, সেই গোপন ফাইলে কিছু একটা কথা লেখা থাকলো যেটা আসলে মিছিমিছি লেখা হয়েছে। সেটাকে সত্যি মনে করে কাজ করতে গিয়ে সেই লোকটা ধরা পড়ে গেল।"

"ইয়েস! ইয়েস! গুড আইডিয়া। মিছিমিছি কী লেখা যায় বল দেখি।"

টুনি একটু চিন্তা করে বলল, "ছোট বাচ্চা হলে বলতে পারতাম। যেমন তাহলে লেখা যেতো, ভালো বাচ্চারা শুধু চকলেট খায় কিংবা ভালো ছেলেরা শুধু সায়েন্স ফিকশন পড়ে কিংবা ভালো ছেলেরা শুধু দাবা খেলে, তারপর দেখতাম হঠাৎ করে কেউ শুধু

চকলেট খাচ্ছে কিনা, সায়েন্স ফিকশান পড়ছে কিনা কিংবা দাবা খেলা শুরু করেছে কিনা!"

ছোটাচ্চু বলল, "বুঝেছি। তুই আসলে মানুষটার চালচলনের একটা পার্থক্যের কথা বলছিস!"

"আমি ঠিক জানি না এইটাই সবচেয়ে ভালো আইডিয়া কিনা, তুমি চিন্তা করে দেখো। ফারিহাপুর সাথেও কথা বলা যায়। এই রকম আইডিয়া ফারিহাপুর খুব ভালো।"

"ঠিকই বলেছিস, এগুলোর ব্যাপারে ফারিহার আইডিয়া খুব ভালো। দেখি ফারিহার সাথে কথা বলে দেখি।"

.

ফারিহার সাথে কথা বলে ছোটাচ্চু শওকত সাহেবকে একটা ভূয়া রিপোর্ট দিল। শওকত সাহেবের ফার্মটা কীভাবে আরো ভালোভাবে চালানো যায় শুরুতে তার ওপর বেশ কিছু প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। যারা কাজ করে তার মাঝে কারা বিশ্বাসী এবং কাদেরকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না, তার ওপর একটা চ্যাপ্টার রয়েছে। কাদেরকে বিশ্বাস করা যায় মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাদের প্রোফাইল কেমন হয় সেই চ্যাপ্টারটি এরকম :

ক. যারা সৎ এবং বিশ্বাসী তারা সাধারণত নীল রং পছন্দ করেন এবং নীল রঙের কাপড় পছন্দ করেন। এই বিষয়টি জন হপকিন্সের ল্যাবরেটরির একটি গবেষণায় দেখা গেছে। তথ্য সূত্র : (এর পরে একটা ভূয়া রেফারেন্স)

খ. কার্নেগি মিলানের মনোবিজ্ঞান বিভাগের গবেষণায় দেখা গেছে (তথ্য সূত্র : এখানে ভূয়া একটি তথ্য সূত্র) সৎ এবং বিশ্বাসী মানুষেরা শিশুদের জন্য লেখা বই পড়তে পছন্দ করেন। তারা প্রায় সর্বক্ষণ রোল্ড ডাল, মার্ক টোয়েন, জে কে রোলিংস এদের লেখা বই নিজেদের কাছে রাখেন।

গ. নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অভ মেডিকেল সায়েন্সে প্রকাশিত গবেষণা পত্র অনুযায়ী (একটি ভূয়া রেফারেন্স) যারা নিজের মস্তিষ্ক সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন তারা কফির পরিবর্তে লেবু চা গ্রহণ করে থাকেন।

চ্যাপ্টারটি এখানেও শেষ হয়নি এরপর এরকম আরো তিনটি বিষয় বলা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে খাবারে শর্করাজাতীয় খাবার উল্লেখযোগ্যভাবে কম, যোগ ব্যায়াম করা এবং ক্লাসিক্যাল মিউজিক শোনা।

এই রিপোর্টটা একটা ফাইলের মাঝে রেখে ফাইলের উপরে বড় বড় করে লেখা হলো ‘একান্ত গোপনীয়’ তারপর ফাইলটা শওকত সাহেবকে দেওয়া হলো। তাকে বলা হলো তিনি যেন ভুল করে ফাইলটা গাড়িতে ফেলে চলে যান এবং ড্রাইভার যেন পরে এসে তাকে ফাইলটা দেয়। ড্রাইভারকে অনেক সময় দেওয়া হবে যেন সে চাইলে ভালো করে ফাইলের ভিতরে ছোটাচ্চু রিপোর্টটা ছবি তুলে যার কাছে পাঠানোর কথা সেখানে পাঠাতে পারে।

.

এক সপ্তাহ পরের ঘটনা। শওকত সাহেব ফারিহাকেও ডেকে পাঠিয়েছেন। ফারিহা শওকত সাহেবের অফিসে গিয়ে দেখল সেখানে ছোটাচ্চু এবং আরো কয়েকজন বসে আছে। তাদের এক নজর দেখেই সে বুঝতে পারল এই ছয়জন নিশ্চয়ই সিনিয়র

ম্যানেজমেন্টের ছয়জন। ছোটাচ্চু টুনিকে যেভাবে এই মানুষগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, ফারিহাকেও ঠিক সেভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তাই তাদের দেখেই ফারিহার হাসি পেয়ে গেল। কারণ সত্যি সত্যি একজন মোটাসোটা, একজন হালকা পাতলা–ছোটাচ্চুর ভাষায় মি. নাদুস-নুদুস এবং মি. চিকন-চাকন। সত্যি সত্যি একজন–নাকে টিস্যু চেপে হাঁচি দিল, খালাম্মাকেও চিনতে পারল। অন্য দুইজনের একজন নিশ্চয়ই ছোটাচ্চুর সিরিয়াল কিলার আর ইংরেজি বলা ইটিস-মিটিস!

ফারিহাকে দেখে শওকত সাহেব একেবারে দাঁড়িয়ে উঠে তাকে নিয়ে এসে তার পাশে বসালেন। খুশিতে টগবগ করতে করতে বললেন, "শাহরিয়ার বলেছে তার রিপোর্টটা লিখতে তুমি সাহায্য করেছ। সেই জন্য আমি তোমাকেও ডেকেছি। তোমাদের রিপোর্টটা অসাধারণ কাজ করেছে!"

"কাজ করেছে?"

"হ্যাঁ।"

মি. নাদুস-নুদুস জিজ্ঞেস করল, "কোন রিপোর্ট স্যার?"

শওকত সাহেব হাসিহাসি মুখে বললেন, "এটা আপনাদের জানার কথা না। খুবই সিক্রেট রিপোর্ট, শুধু আমি দেখেছি। এবং–"

মি. চিকন-চাকন জিজ্ঞেস করল, "এবং?"

"এবং আপনাদের ভিতর থেকে যদি কেউ আমার গোপন রিপোর্ট লুকিয়ে দেখে থাকেন। দেখেছেন নাকি?"

সবাই মাথা নাড়ল। একজন বলল, “না স্যার কেমন করে দেখব?”

“সেখানে লেখা ছিল, “সৎ এবং বিশ্বাসী মানুষেরা নীল কাপড় পরে, বাচ্চাদের বই পড়ে, লেবু চা খায়!”

ছোটাচ্চু বলল, “সব ভূয়া। বানিয়ে বানিয়ে লিখেছি।”

শওকত সাহেব মি. এলার্জিম্যানের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনি কিন্তু বুঝেন নাই এটা একটা ট্র্যাপ! ভূয়া। বিশ্বাস করে বসে থেকে নীল শার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হাতের বইটা হ্যারি পটারের বই না? বাচ্চাদের বই। চাটাও নিশ্চয়ই লেবু চা?”

মি. এলার্জিম্যানের নাকটা সাধারণত লাল হয়, এখন পুরো মুখটাই লাল হয়ে উঠল। থমথমে গলায় বলল, “স্যার! আপনি কী বলছেন স্যার? আপনি কী বোঝাতে চাইছেন আমি গোপনে আপনার ফাইল পড়ি?”

শওকত সাহেব বললেন, “আই অ্যাম সরি। আমার ভুল হতেও পারে। সবাই কখনো না কখনো নীল সার্ট পরে। হ্যারি পটার কে পড়ে নাই! সর্দি কাশি হলে লেবু চা খুবই উপকারী। আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলাটা আমার ভুল হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না।” শওকত সাহেব হঠাৎ সুর পাল্টে বললেন, “তবে—”

সবাই চুপ করে রইল। শওকত সাহেব সবার মুখের দিকে এক নজর তাকিয়ে বললেন, “তবে আমার ড্রাইভার ব্যাটা ভারী বজ্জাত। গোপনে আমার টপ সিক্রেট ফাইলের ছবি তুলে রেখেছে। পুলিশকে জানিয়েছিলাম। আজ সকালে তাকে জেরা করতে নিয়ে গেছে। সেখান থেকে জানিয়েছে তার মোবাইলে আমার ফাইলের ছবি পাওয়া গেছে। যার কাছে পাঠিয়েছে তার

নম্বরও পেয়েছে। বারোটার সময় ড্রাইভারের নম্বর থেকে সেই নম্বর ফোন দেবে। বারোটা কী বেজেছে?”

মি. নাদুস-নুদুস বলল, “আর দুই মিনিট স্যার।

মি. এলার্জিম্যান হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, “আমার একটা জরুরি কাজ আছে স্যার। এক্ষুণি যেতে হবে।”

“অবশ্যই যাবেন, কিন্তু দুই মিনিট পরে। বসেন।” এলার্জিম্যান বসল না, চলে যেতে চেষ্টা করল, তখন সিরিয়াল কিলার হুংকার দিয়ে বলল, “স্যার আপনাকে বসতে বলেছে শুনেন নাই? আপনি কি চান আমি আপনকে ধরে এনে জোর করে বসাই?”

মি. এলার্জিম্যান এবারে এসে তার চেয়ারে মাথা নিচু করে বসল। ঘরে কেউ কোনো কথা বলছে না, একেবারে সত্যিকারের পিনপতন নিঃশব্দতা। ঠিক তখন মি. এলার্জিম্যানের টেলিফোনটা বেজে উঠল, শওকত সাহেব শান্ত গলায় বললেন, “দেখেন তো কে টেলিফোন করেছে। আমার ড্রাইভার কিনা-

ফারিহা তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আমার মনে হয় আমার এখানে থাকা ঠিক হবে না, যদি অনুমতি দেন আমি যেতে চাই।”

ছোটাচ্চু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “সেটাই ভালো, আমিও ফারিহাকে পৌঁছে দেই।”

শওকত সাহেব কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন, তারপর বললেন, “ঠিক আছে পরে কথা হবে।“

.

এক সপ্তাহ পরে একটা আইসক্রিম পার্লারে শওকত সাহেব তার স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে এসেছেন। ছোটাচ্চুর ফারিহা এবং টুনিকে নিয়ে আসার কথা কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাসার সব বাচ্চাকে নিয়ে এসেছে!

শওকত সাহেব সব বাচ্চাদের জন্য গিফট কিনে রেখেছেন। কোনটা কার বলা নেই, যার যেটা ইচ্ছা সেটা নিতে পারে। বার্গার খাওয়ার পর আইসক্রিম খাওয়া হবে তার আগে গিফট খোলা যাবে না। নানা সাইজের বাক্স, কোনটার ভিতরে কী আছে কেউ জানে না তারপরেও কে কোনটা নেবে আগে থেকে ঠিক করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে বাক্স নিয়ে প্রচণ্ড কাড়াকাড়ি এবং মারামারি হবে। আইসক্রিম পার্লারে সেটা নিয়ে ভয়ংকর টেনশান!

টুনির ভিতরে অবশ্য কোনো টেনশন নেই। তার সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য শওকত সাহেব সব বাচ্চাদের এখানে নিয়ে এসেছেন। কাজেই তার ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা করা মানায় না।

সে বার্গারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে একটা মশার পিনপিন শব্দ শুনল। এতো হাইফাই আইসক্রিম পার্লারে একটা মশা ঢুকে গেছে, মশাটা খুবই চালু তাতে সন্দেহ নেই। মশাটা টুনির হাতে বসেছে এক থাবায় সেটাকে শেষ করে দেওয়া যায়। টুনি অবশ্য মশাটাকে শেষ করল না, টোকা দিয়ে উড়িয়ে দিল। এই মশা দিয়ে সে রহস্যভেদ করেছে তাই তাদেরকে একটু মায়া নিশ্চয়ই করা যায়।

৬. সুষমা মেঘবতী

টুনিদের স্কুলে সাধারণত বছরের মাঝখানে কেউ ভর্তি হয় না। কিন্তু দেখা গেল টুনিদের ক্লাশেই হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার আগে নতুন একটা মেয়ে ভর্তি হয়েছে। নতুন কেউ ভর্তি হলে তাকে বাজিয়ে নিতে হয়। যারা মোটামুটি ভালো ছাত্র কিংবা ছাত্রী তারা বাজিয়ে নেয় দেখার জন্য এই নতুন মানুষটি লেখাপড়ায় কীরকম–তার কারণে তাদের রোল নম্বর এক দুই ঘর পিছিয়ে যাবে কিনা। যারা দুষ্টু তারা বাজিয়ে নিতে চায় দেখার জন্য নতুন মানুষটি কী রকম দুষ্টু, তাদের দল কী ভারী করা যাবে কিনা সেইটা জানতে চায়। যারা পাজি টাইপের তারা বাজিয়ে দেখতে চায় নতুন মানুষটা সহজ সরল টাইপের কিনা সেটা দেখার জন্য, তাকে জ্বালাতন করে আনন্দ পাওয়া যায় কিনা সেটা বোঝার জন্য!

তবে মজার ব্যাপার হলো কোনো দলই বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। দেখা গেল মেয়েটা কথা বলতেই রাজি না। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিড়বিড় করে কিছু একটা বলে। বিড়বিড় করে কী বলে সেটা নিয়েও কেউ পুরোপুরি নিশ্চিত না–কয়েকজন বলছে সে বলে, "আমি এখন কথা বলতে চাই না", বলছে সে বলে, "প্লিজ আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না", আবার কয়েকজন বলছে সে বলে, "দূর হও–জাহান্নামে যাও বেকুব কোথাকার!" পরিচয় হওয়ার আগেই একজন সবাইকে বেকুব ডাকবে, জাহান্নামে যেতে বলবে সেটা বিশ্বাস হয় না কিন্তু কেউ আর কোনো কিছুতেই নিশ্চিত না।

কয়েক দিনের ভিতরেই সবাই হাল ছেড়ে দিল। বুঝে গেল মেয়েটা অন্যরকম, হয় বাড়াবাড়ি অহংকারী না হয় তার কোনো একটা ঝামেলা আছে। মেয়েটার নাম সুষমা মেঘবতী এবং তার রোল

নম্বর বাহান্ন। এ ছাড়া আর কেউ কিছু জানতে পারল না এবং মনে হলো এইটুকু দিয়েই সবাইকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

সবাই হাল ছেড়ে দিলেও টুনি হাল ছাড়ল না। সে একটিবারও মেয়েটির কাছে যায়নি কিংবা তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেনি। কিন্তু মেয়েটা সম্পর্কে জানার জন্য তার এক ধরনের কৌতূহল হলো। সে এটাও বুঝতে পারল মেয়েটা সম্পর্কে আসলেই যদি কিছু জানা সম্ভব হয় তাহলে সেটা তার পক্ষেই সম্ভব, আর কেউ সেটা পারবে না।

টুনি তাই মেয়েটা যেখানে বসে তার থেকে কয়েকটা বেঞ্চ পিছনে এক পাশে একটু সরে গিয়ে বসতে লাগল যেন মেয়েটাকে সারাক্ষণ দেখতে পারে। কয়েকদিন তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সে মেয়েটা সম্পর্কে কয়েকটা বিষয় আবিষ্কার করল। একটি বিষয় হচ্ছে কোনো একটা কারণে মেয়েটার খুবই মন খারাপ। কাউকে সে কিছু বুঝতে দেয় না কিন্তু উদাস মুখে কোনো একদিকে তাকিয়ে থাকে তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর খুব সাবধানে চোখের কোণা থেকে এক ফোঁটা পানি মুছে ফেলে। মেয়েটার মনে কোনো একটা কষ্ট যার কথা কেউ জানে না। টুনির খুব মায়া হয় তার জন্য।

টুনি আরো একটা জিনিস লক্ষ করল। মেয়েটা মাঝে মাঝেই তার ব্যাগের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কিছু একটা ধরে নিশ্চিত হতে চায় সেটা এখনো সেখানে আছে। অনেক সময় ব্যাগের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বসে থাকে, আনমনা হয়ে কোনো একদিকে তাকিয়ে থাকে।

যখন টিফিনের ছুটি হয় তখন সবাই হৈচৈ করে চিৎকার করে ক্লাশরুম থেকে বের হয়ে যায় শুধু এই মেয়েটা চুপ করে বসে থাকে। অনেক সময় দুই হাত টেবিলে রেখে সেই হাতে মাথা

গুঁজে বসে থাকে। মেয়েটাকে আরো ভালো করে লক্ষ করার জন্য একদিন টুনি টিফিন ছুটিতে বের না হয়ে নিজের সিটে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার ডাইরি লিখতে লাগল–তাকে দেখলে মনে হতে পারে এই ডাইরি লেখার ওপরেই তার জীবন মরণ নির্ভর করছে। মেয়েটা একা থাকতে চায়। তাই নিশ্চয়ই মনে মনে মেয়েটা টুনির উপরে বিরক্ত হয়েছে কিন্তু তার কিছু করার নেই। মেয়েটা যেন কিছুই সন্দেহ না করে সে জন্য টুনি একবারও মাথা তুলে তাকাল না। চোখের কোণা দিয়ে বুঝতে পারল মাঝে মাঝে মেয়েটি মাথা ঘুরিয়ে টুনিকে দেখছে। যখন বুঝতে পারল টুনি তাকে লক্ষ করছে না তখন খুব সাবধানে একটা বই বের করে পড়তে শুরু করল। টুনি অবশ্যি কিছুক্ষণেই বুঝে গেল মেয়েটি আসলে বইটি পড়ছে না। কারণ একবারও বইয়ের পৃষ্ঠা ওল্টালো না বইয়ের একজায়গাতেই তাকিয়ে আছে। মনে হয় বইয়ের ভিতরে কিছু একটা রাখা আছে, মেয়েটি সেটির দিকে তাকিয়ে আছে।

টুনি তখন মেয়েটার সাথে সহজ হওয়ার জন্য তার পরের কাজগুলো শুরু করল। মেয়েটা যেহেতু কথা বলতে চায় না তাই সে মেয়েটার সাথে এমনভাবে কথা বলবে যেন মেয়েটার কথার উত্তর দিতে না হয়। কয়েকদিন এভাবে কথা বললে মেয়েটা নিশ্চয়ই তাকে মেনে নিবে।

তাই টুনি বেশ শব্দ করে তার ডাইরি লেখা শেষ করল এবং টুনি বুঝতে পারল মেয়েটা সাথে সাথে তার বইটা বন্ধ করে ফেলেছে। টুনি তখন আরো শব্দ করে তার সিট থেকে উঠল এবং মেয়েটা তখন বইটা তার ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলল। টুনি ক্লাশরুম থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে মেয়েটার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, “তোমার নামটা কী সুইট! সুষমা মেঘবতী। ইশ! আমার যদি তোমার মতো

এতো সুন্দর একটা নাম থাকতো! সুষমা মেঘবতী! আমার আব্বু আম্মু আমার কী নাম রেখেছে জান?

টুনি মেয়েটার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না, কথা বলতে থাকল, "আমার নাম রেখেছে টুনি! টুনি একটা নাম হলো? সবাই ইয়ারকি করে ডাকে টুনটুনি। চিন্তা করতে পার? এখন ছোট আছি ঠিক আছে। যখন বড় হব চাকরি-বাকরি করব তখন কী হবে? ধর স্কুলের টিচার হলাম–ছাত্রছাত্রীরা আমাকে ডাকবে টুনটুনি ম্যাডাম! ছিঃ ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা!"

টুনটুনি হতাশ হওয়ার ভঙ্গী করতে করতে মেয়েটার কোনো উত্তর দেবার জন্য অপেক্ষা না করেই বের হয়ে গেল। প্রথম দিন মেয়েটাকে নিজের নামটা বলে দেওয়া হলো–আজকে এটুকুই থাক। আস্তে আস্তে এগুতে হবে।

পরের দিন টিফিন ছুটির পর টুনি অপেক্ষা করল ক্লাশরুমটা খালি হয়ে যাবার জন্য। যখন পুরোপুরি খালি হয়ে গেল তখন সে তার সিট থেকে উঠে বের হওয়ার জন্য দরজার দিকে এগুতে থাকে। মেয়েটার কাছাকাছি এসে সে দাঁড়িয়ে গিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার নামের দুটো অংশই এতো সুন্দর! সুষমা আর মেঘবতী! আমি ঠিক করেছি তোমাকে মেঘবতী বলে ডাকব।" টুনি তারপর টেনে টেনে উচ্চারণ করল, "মে-ঘ-ব-তী! মনে হয় একটা কবিতা বলছি।" তারপর আবার তার নামটা উচ্চারণ করতে করতে বের হয়ে গেল। মেয়েটাকে আজকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে সে তাকে ডাকাডাকি করবে। মনে মনে একটু রেডি হয়ে থাকুক।

পরের দিন টুনি আরেকটু এগিয়ে গেল, পিছন থেকেই তাকে ডাকলো, "মেঘবতী!"

মেয়েটা একটু চমকে উঠে তার দিকে তাকালো। টুনি তখন তাকে বলল, "মেঘবতী, তুমি তো নতুন এসেছ সবার সাথে পরিচয় হয় নাই। তোমাকে কয়েকজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। তোমার কাজে লাগবে। প্রথমেই তোমার রাজুকে চিনতে হবে। রাজু হচ্ছে আমাদের ফার্স্টবয়। লেখাপড়ায় জন্মেও কেউ তাকে হারাতে পারবে না। বাম হাতে লিখেও পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে যাবে। যারা ফার্স্টবয় হয় তারা সাধারণত হয় অহংকারী আর হিংসুক। কিন্তু আমাদের রাজু মোটেও অহংকারী না হিংসুকও না। যদি নৌকার অঙ্ক না হলে বানরের বাঁশ বেয়ে ওঠার অঙ্কে আটকে যাও, তুমি রাজুকে জিজ্ঞেস করলে সাথে সাথে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে। শুধু অঙ্ক না সে বাংলা ইংরেজি সব জানে। বিবমিষা বানান জিজ্ঞেস করে দেখো সে বলে দেবে। তুষ-ই-কার দীর্ঘ-ঈ-কার দন্ত্য-স তালব্য-শ মূর্ধন্য-ষ কোনো গোলমাল হবে না। খাটাসের ইংরেজি জিজ্ঞেস করে দেখো কিংবা আল-জিহ্বার ইংরেজি জিজ্ঞেস করে দেখো, সেইটাও বলে দেবে। রাজু হচ্ছে একেবারে পারফেক্ট ছেলে। তাকে নিয়ে অনেক কাহিনী আছে পরে তোমাকে একদিন বলব।"

টুনি টানা কথা বলে একটু দম নেওয়ার জন্য থামল। মেঘবতী কেমন যেন অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে টুনির সব কথা বুঝে উঠতে পারছে না। টুনি অবশ্য সেটা নিয়ে মাথা ঘামালো না, আবার শুরু করল, "বুঝলে মেঘবতী। রাজুর ঠিক উল্টা হচ্ছে সবুজ। রোল নাম্বার ফর্টি থ্রী। আগে দুষ্টু ছিল এখন যতই দিন যাচ্ছে সে পাজি হয়ে যাচ্ছে। যদি দেখে একজন ছেলে বা মেয়ে একটু নরম টাইপের ব্যস তাহলেই হলো, তাকে জ্বালাতন শুরু করবে। তোমাকে দেখে অবশ্য নরম টাইপ মনে হচ্ছে না কাজেই তোমার মনে হয় কোনো ঝামেলা হবে না–তবু জানিয়ে রাখলাম। মনে থাকবে তো? রোল নাম্বার ফর্টি থ্রী। তাকে নিয়েও অনেক কাহিনী আছে, যদি শুনতে চাও তোমাকে বলব।"

টুনি মুখটা হাসিহাসি করে তার বক্তৃতা শেষ করে হেঁটে হেঁটে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। মেঘবতী নিশ্চয়ই ভাবছে তার একটু মাথা খারাপ। ভাবুক। মেয়েটার মনে কিছু একটা নিয়ে কষ্ট, তার একজন বন্ধু দরকার।

টুনি পরের দিন কী বলবে সেটা মোটামুটি ঠিক করে রেখেছিল কিন্তু তার আগেই একটা গুরুতর ঘটনা ঘটে গেল।

.

সেদিন স্কুল ছুটির পর টুনি বের হয়েছে। স্কুলের সামনে বেশ কয়েকটা গাড়ি। যারা বড়লোকের ছেলেমেয়ে তাদেরকে নেওয়ার জন্য গাড়ি এসেছে। যাদের বাসা একটু দূরে তারা রিকশায় উঠেছে। অন্যেরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। টুনির হেঁটে যেতে ভালোই লাগে।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর হঠাৎ টুনি লক্ষ করল মেঘবতী তার সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। টুনি একটু চিন্তা করল, তাড়াতাড়ি হেঁটে তাকে ধরে ফেলে দুজন একসাথে হেঁটে যাবে কী না। কিন্তু মেঘবতী বেশ খানিকটা দূরে, তাড়াতাড়ি হেঁটেও তাকে ধরে ফেলা সহজ হবে না। টুনি তাই তার পিছু পিছুই যাওয়া ঠিক করল। যদি এর মাঝে সে তার বাসায় ঢুকে যায় তাহলে বাসাটা চিনে রাখবে।

টুনি দেখল মেঘবর্তী হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। দূর থেকে এটা কিসের দোকান বোঝা যাচ্ছে না। মেঘবতী খানিকক্ষণ কিছু একটা চিন্তা করল তারপর আবার হেঁটে যেতে শুরু করল।

খানিকদূর গিয়ে আবার ঘুরে দোকানটার সামনে ফিরে এলো, দেখে বোঝাই যাচ্ছে সে দোকানটাতে ঢুকবে কী ঢুকবে না

পুরোপুরি ঠিক করতে পারছে না। তারপর হঠাৎ কী মনে করে দোকানে ঢুকে গেল।

টুনি দোকানটা ভালো করে দেখার জন্য রাস্তার অন্যপাশে গিয়ে হেঁটে একটু সামনে গিয়ে বুঝতে পারল এটা একটা ফার্মেসি, ওষুধের দোকান। টুনি রাস্তার অন্যপাশে অপেক্ষা করে এবং বেশ খানিকক্ষণ পর মেঘবতী বের হয়ে এলো, হাতে একটা ছোট প্যাকেট। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে এদিক-সেদিক তাকিয়ে ছোট ব্যাগটার ভিতর থেকে কোনো একটা ওষুধ বের করে, তারপর তার স্কুলের ব্যাগ থেকে হলুদ রঙের একটা পলিথিনের ব্যাগের ভিতর ওষুধটা রাখল। তারপর পলিথিনের ব্যাগটার ভিতরে তাকাল, সেখানে কী আছে একটু দেখে সেটা তার স্কুলের ব্যাগের ভিতর রেখে হাঁটতে শুরু করল। ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক, মেঘবর্তী একটা ওষুধ কিনে একটা ব্যাগে রাখছে, টুনি সেটা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাতো না কিন্তু হঠাৎ করে তার ভিতরে একটা খটকা লাগল। কারণ দেখল মেঘবতী হাঁটতে হাঁটতে আরেকটা ফার্মেসির সামনে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর সেটাতে ঢুকে গেল। তার যদি ওষুধ কিনতেই হবে সব ওষুধ একটা ফার্মেসি থেকে কেন কিনছে না?

টুনি রাস্তার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে মানুষজনের ভিতর আড়ালে থেকে লক্ষ করে। মেঘবতী কিছুক্ষণ পর আবার একটা ছোট প্যাকেট নিয়ে বের হয়ে এলো। আবার ছোট প্যাকেট থেকে একটা ওষুধ বের করে তার হলুদ ব্যাগে রাখল। তারপর খালি প্যাকেটটা রাস্তার পাশে একটা ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে হাঁটতে লাগল। মেঘবতী ফার্মেসি থেকে কোনো একটা ওষুধ কিনে কিনে এক জায়গায় রাখছে। কী এমন ওষুধ যেটা একটা ফার্মেসি থেকে কেনা যায় না? টুনির বুকটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠে। ঘুমের ওষুধ না তো?

মেঘবতী আবার হাঁটছে, আবার একটা ওষুধের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। এবারে কী হবে টুনি সেটা জানে। তবু সে দাঁড়িয়ে রইল। সত্যি সত্যি মেঘবতী মেয়েটা একটা ওষুধ কিনে তার হলুদ প্যাকেট রাখছে। প্রেসক্রিশন ছাড়া ঘুমের ওষুধ বিক্রি করা যায় না, অনেক অনুরোধ করলে হয়তো একটা বিক্রি করতে পারে, মেঘবতী নিশ্চয়ই তাই করছে। এক দোকান থেকে পারবে না তাই অনেকগুলো দোকান থেকে কিনছে। কিন্তু সত্যিই কী ঘুমের ওষুধ? অন্য কিছু যদি হয়? ব্যাপারটা পুরোপুরি না জানা পর্যন্ত টুনি শান্তি পাচ্ছে না। কিন্তু কীভাবে সেটা পুরোপুরি ঠিকভাবে জানতে পারবে? ফার্মেসিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে, কিন্তু তাকে কি বলবে? একটু কায়দা করে জিজ্ঞেস করতে হবে যেন কোনো কিছু সন্দেহ না করে। টুনি দেখল মেঘবতী হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে রাস্তার পাশে দোকানের সাইনবোর্ড দেখতে দেখতে যাচ্ছে, নিশ্চয়ই ফার্মেসি খুঁজে বেড়াচ্ছে। টুনি তাকে চলে যেতে দিল। তারপর রাস্তা পার হয়ে ফার্মেসিটাতে ঢুকে গেল। একটু আগে এখানে মেঘবতী ঢুকে একটু ওষুধ কিনেছে।

ফার্মেসির ভিতরে একজন মানুষ ওষুধ কিনছে, টুনি তার পিছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। দোকানের আরেকজন কর্মচারী এগিয়ে এসে কাউন্টারের ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করল, "কী লাগবে তোমার?"

টুনি বলল, "আমি ঠিক জানি না –"

মানুষটার মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। বলল, "কী লাগবে তুমি জান না? সমস্যাটা কী শুনি।"

টুনি বলল, "আসলে আমার, চাচি আমাকে আর আমার কাজিনকে একটা ওষুধ কিনে নিতে বলেছে। কাগজটা ভুলে বাসায় রেখে এসেছি।"

“ওষুধের নাম জান?”

“নাহ্। আমার কাজিন একটু আগে এদিক দিয়ে গেছে। সে ওষুধটা কিনলে আমাকে আর কিনতে হবে না।”

“তোমার কাজিন কে, আমরা কীভাবে বলব?”

“ঠিক আমার মতো বয়স, স্কুল ড্রেস পরা।”

মানুষটা মাথা নাড়ল বলল, “হ্যাঁ একটু আগে এসেছিল। এক ডজন টেবলেট কিনতে এসেছিল। প্রেসক্রিশান ছাড়া এসেছে তাই আমরা বিক্রি করতে চাই নাই। অনেক জোরাজুরি করল তখন একটা দিয়েছি।”

টুনি ভান করল সে জানতে পেরে অনেক স্বস্তি পেয়েছে। বলল, “গুড। এখন মনে হয় একটাতেই হবে। চাচি চাইলে পরে আরো বেশি কিনতে পারবে।“

মানুষটা বলল, “প্রেসক্রিপশান ছাড়া কেউ দিবে না। আর তোমরা ছোট মানুষেরা কেন এই ওষুধ কিনতে এসেছ? বলবে বড় মানুষদের পাঠাতে।”

টুনি বলল, “বলব। বলব। কী ওষুধ ছিল ওইটা? দরকারী ওষুধ?”

“যার ঘুম হয় না তার জন্য অনেক দরকারী।”

“ও আচ্ছা, আচ্ছা।” টুনি বলল, “থ্যাংকু থ্যাংকু।” সে চলে যেতে যেতে কী মনে করে আবার ফিরে এল, বলল, “আচ্ছা আপনাদের কাছে কি ভিটামিন সি ওষুধটা আছে?”

“হ্যাঁ আছে।”

“সেইটা কিনতে কি প্রেসক্রিশান লাগে?”

“না! এটা লজেন্সের মতো। চুষে চুষে খায়। প্রেসক্রিপশান লাগে না।”

টুনি তার ব্যাগ খুলে দেখল তার কাছে কত টাকা আছে, তারপর বলল, “আমাকে দুই পাতা দিবেন?”

মানুষটা দুই পাতা ভিটামিন সি লজেন্স দিল। দেখে মনে হয় ওষুধ কিন্তু চুষে খেতে বেশ মজা। টুনি অবশ্যি মজা করে খাওয়ার জন্য কিনল না। তার মাথায় অন্য একটা চিন্তা কাজ করছে, সেখানে কাজে লাগবে।

বাসায় ফিরে যাওয়ার সময় টুনির কেমন জানি অশান্তি হতে থাকে। মেঘবতী মেয়েটা এভাবে ঘুমের ওষুধ কিনছে কেন? মানুষ সুইসাইড করার জন্য ঘুমের ওষুধ খায়। তাহলে কী এই মেয়েটা সুইসাইড করার কথা চিন্তা করছে? এতো ছোট বাচ্চা মেয়েরা কী কখনো সুইসাইডের কথা চিন্তা করে? কী সর্বনাশ! বড়দের সাথে এইটা নিয়ে কথা বলতে হবে।

.

টুনির যখন বড় মানুষদের সাথে কথা বলতে হয় তখন সে সবসময় ঝুমু খালাকে দিয়ে শুরু করে। ঝুমু খালাকে যত আজব একটা জিনিসই বলা হোক না কেন সে অবাক হয় না। পৃথিবীর যে কোনো বিষয়ে ঝুমু খালার নিজের একটা মত থাকে। তাই আজকেও টুনি ঝুমু খালাকে দিয়ে শুরু করল। রান্নাঘরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, “ঝুমু খালা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?”

ঝুমু খালা চুলার আগুন কমাতে কমাতে বলল, “কী কথা? কোনো সমস্যা?“

“না, কোনো সমস্যা না।”

“বল, কী বলবা।”

“ছোট মেয়েরা কী কখনো সুইসাইড করে?”

ঝুমু খালা মাথা নেড়ে বলল, “কী বল তুমি? ছোট মেয়েরাই তো সুইসাইড খায়।”

“সুইসাইড কেউ খায় না ঝুমু খালা।” টুনি শুদ্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করল, বলল, “সুইসাইড করে।”

ঝুমু খালা বলল, “তুমি আমারে শিখাইবা কোনটা খায় আর কোনটা করে? তুমি কোনটা করছ বল?”

টুনি বলল, “আমি কোনোটা করি নাই।”

ঝুমু খালা বুকে থাবা দিয়ে বলল, “আমি কমপক্ষে চারবার চেষ্টা করছি।”

টুনি চোখ কপালে তুলে বলল, “তুমি চারবার সুইসাইড করার চেষ্টা করেছ? কী সর্বনাশ!”

“সর্বনাশের কী আছে? গেরাম ঘরে ছোটবেলায় সবাই চেষ্টা করে।”

“কেন?”

“মায়ে গালি দেয়। তখন মনে হয় এই জেবন রাখুম না। পানিতে ফাল দেয়।”

“ফাল না ঝুমু খালা। লাফ।”

“একই কথা।”

“ঠিক আছে। কিন্তু পানিতে লাফ দিলে কী হয়?

“গেরামঘরের পোলাপান তো সাঁতার জানে। তাই পানিতে ফাল দিয়া লাভ হয় না। একটু পরে যখন শীত লাগে তখন পানি থেকে উইঠা আসে। বাড়ি আসলে মা আবার আচ্ছামতোন বানায়। গেরামঘরে সুইসাইড খাওয়ার মাঝে কোনো শান্তি নাই।“

টুনি বুঝতে পারে ঝুমু খালার সাথে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলে লাভ নাই, ঝুমু খালা মনে হয় ব্যাপারটা ধরতেই পারছে না। তাই সে তখন গেল ছোটাচ্চুর কাছে। ছোটাচ্চু তার ল্যাপটপ কোলে নিয়ে বিছানায় বসে আছে। টুনি গিয়ে বলল, “ছোটাচ্চু তোমাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি?”

ছোটাচ্চু গভীর মনোযোগ দিয়ে তার ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “না।”

টুনি অবাক হয়ে বলল, “না?”

ছোটাচ্চু বলল, “আমি খুব একটা জরুরি কাজ করছি। তোর কথা তো আমার কাজ থেকে জরুরি হতে পারবে না।

“যদি হয়?”

ছোটাচ্চু এখন মুখ তুলে টুনির দিকে তাকালো, বলল, “কী কথা, শুনি। যদি জরুরি না হয় তাহলে তোর খবর আছে।”

টুনি বলল, “আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে ছোট বাচ্চারা কি কখনো সুইসাইড করে?”

ছোটাচ্চু কিছুক্ষণ হা করে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, “কোন ছোট বাচ্চা সুইসাইড করতে চাচ্ছে?”

“কেউ চাচ্ছে না। আমি জানতে চাইছি কখনো ছোটরা সুইসাইড করে কি না!”

“কত ছোট বাচ্চা?’

টুনি ইতস্তত করে বলল, “এই ধর আমার বয়সী।

“তোর বয়সী?”

“হ্যাঁ।”

ছোটাচ্চু কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ গলার স্বর খুবই নরম করে বলল, “টুনি, তোর কী হয়েছে? এরকম কথা কেন বলছিস? আয়, আমার কাছে, বস। বল আমাকে কী হয়েছে। এরকম কথা তোর মাথায় কেন এসেছে? কে কী করেছে?’

টুনি হতাশ হয়ে মাথা নেড়ে বলল, “ওহ্ ছোটাচ্চু! আমি সুইসাইড করার কথা ভাবছি না। আমি তোমার কাছে জানতে চাইছি আমার বয়সী ছেলেমেয়েরা সুইসাইড করে কি না!”

“তুই ভাবছিস না?”

“না।”

“তাহলে যে বললি খুবই জরুরি কথা?”

“ওহ্ ছোটাচ্চু! শুধু আমি করতে চাইলে জরুরি? অন্য কেউ করতে চাইলে জরুরি না?”

“কে করতে চাইছে? আমাদের বাসার কেউ?”

টুনি আবার হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল, বলল, “না ছোটাচ্চু। আমাদের বাসার কেউ না। “

“তাহলে কে?”

“সেটা এখন তোমাকে বলে লাভ নেই। তুমি শুধু বল আমাদের বয়সী বাচ্চারা সুইসাইড করে কি না।”

ছোটাচ্চু টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, “তোর বয়স জানি কত? দশ?”

“না। তেরো।“

ছোটাচ্চু মুখটা সূঁচালো করে কিছুক্ষণ উপরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “এসএসসি পরীক্ষার পর জিপিএ ফাইভ না পেয়ে অনেক ছেলেমেয়ে সুইসাইড করে, কিন্তু তাদের বয়স তোর বয়স থেকে বেশি। ঈদের দিন নতুন জামা কিনে দেয় নাই বলে একবার একটা মেয়ে সুইসাইড করেছিল কিন্তু তার বয়স কত ছিল সেটা মনে নাই–”

টুনি বলল, “গুগল ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করে দেখো–”

“কী ভাইয়া?”

“গুগল ভাইয়া। গুগল চাচ্চুও ডাকতে পার, তুমি যদি চাও।”

ছোটাচ্চু এবারে বুঝতে পারল, চোখ গরম করে টুনির দিকে তাকাল, তারপর বলল, “সবকিছু নিয়ে ইয়ারকি!”

“ইয়ারকি কখন করলাম? একটু সম্মান করে কথা বললাম।”

ছোটাচ্চু তখন ল্যাপটপে খোঁজা শুরু করল। একটু পরে মুখ সূঁচালো করে বলল, “হ্যাঁ, তেরো বছরের কম বয়সীরাও সুইসাইড করে। আমেরিকায় বছরে প্রায় সত্তর জন কমবয়সী বাচ্চা সুইসাইড করে!”

“সর্বনাশ!”

“হ্যাঁ, যখন বয়সন্ধির সময় হয় তখন ছেলেমেয়েরা খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ে, অল্প কিছুতেই তারা খুব আপসেট হয়ে যায়। তখন সুইসাইড বেশি হয়।”

“কীভাবে সুইসাইড বন্ধ করা যায় কিছু লিখেছে?”

ছোটাচ্চু আরো কিছুক্ষণ তার ল্যাপটপ ঘাঁটাঘাঁটি করল, তারপর বলল, “ঐ তো, কমনসেন্স যেটা বলে সেটাই। যদি দেখা যায় কারো ভিতরে সুইসাইডের ভাব আছে তাহলে বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই সাবধান থাকা, চোখে চোখে রাখা। যেসব ব্যবহার করে সুইসাইড করা যায় সেগুলো সরিয়ে রাখা।”

টুনি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “থ্যাংকু ছোটাচ্চু।”

ছোটাচ্চু আরো বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “তোদের এই বাচ্চা বয়সে যদি সুইসাইড নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় তাহলে তো মুশকিল!”

টুনি কিছু বলল না।

.

রাতে টুনির আম্মু টুনিকে জিজ্ঞেস করলেন, “কি রে টুনি তোর কী হয়েছে? এতো চুপচাপ কেন?”

আম্মুদের কাছে কিছু গোপন রাখা যায় না, টুনি তাই তার চেষ্টাও করল না। বলল, “আমাদের ক্লাশে একটা নতুন মেয়ে এসেছে তাকে নিয়ে খুব চিন্তা হচ্ছে।”

“কী নিয়ে চিন্তা হচ্ছে?”

“মেয়েটা কারো সাথে কথা বলে না। সারাক্ষণ একা একা বসে থাকে। মেয়েটার সবসময় মন খারাপ থাকে। মাঝে মাঝে কাউকে না দেখিয়ে চোখের

পানি মুছে। কিন্তু সেই জন্য চিন্তা হচ্ছে না। চিন্তা হচ্ছে কারণ মেয়েটা ফার্মেসি ঘুরে ঘুরে ঘুমের ওষুধ কিনছে?”

“ঘুমের ওষুধ?” আম্মু ভুরু কুঁচকালেন, “তুই ঠিক জানিস?”

“হ্যাঁ আম্মু। প্রেসক্রিপশান নাই তাই ফার্মেসি তার কাছে ঘুমের ওষুধ বিক্রি করতে চায় না-বুঝিয়ে সুঝিয়ে একটা একটা করে কিনে জমা করছে।”

“কী সর্বনাশ!”

“হ্যাঁ আম্মু, কী করব বুঝতে পারছি না।”

আম্মু মাথা নাড়লেন, বললেন, “এটা আর ছোটদের ব্যাপার নাই। এটা এখন বড়দের ব্যাপার। তার আব্বু আম্মুকে জানাতে হবে, টিচারদের জানাতে হবে। এখানে কোনো রিস্ক নেওয়া যাবে না।”

“বুঝেছি আম্মু।

“কালকে গিয়েই তোদের টিচারদের বলবি। স্কুলের অফিসে নিশ্চয়ই তার গার্জিয়ানদের ফোন নম্বর আছে। তাদেরকে ফোন করতে হবে।”

টুনি মাথা নাড়ল, তারপর জিজ্ঞেস করল, “যারা সুইসাইড করতে চায় তাদেরকে বোঝানোর কোনো উপায় নাই?”

“নিশ্চয়ই এসব কাজের জন্য প্রফেশনাল কাউন্সেলর আছে, কিন্তু তোরা

তো আর এক্সপার্ট না। তোরা কী বুঝাবি? তবে

“তবে কী আম্মু?”

“সব দেশে সুইসাইড হট লাইন থাকে। যে সুইসাইড করতে যাচ্ছে শেষ মুহূর্তে অনেক সময় তারা সেই হট লাইনে ফোন করে। তখন তাকে টেলিফোনে হেল্প করে।”

“কীভাবে আম্মু?”

“আমি যতদূর জানি তারা শুধু মানুষটাকে কথা বলতে দেয়–তারা খুব দরদ দিয়ে তাদের কথা শুনে। কোনো মানুষ যদি অনেক

কষ্টে থাকে তখন যদি মানুষটা তার প্রাণের বন্ধুর সাথে কথা বলে তাহলেই তার কষ্টটা অনেক কমে আসে।”

টুনি হতাশভাবে মাথা নাড়ল। বলল, “মেয়েটার কোনো বন্ধু নাই আম্মু, মেয়েটা কারো সাথে কথা বলে না।”

“তাহলে প্রফেশনাল হেল্প ছাড়া গতি নাই। কালকেই তোদের টিচারকে জানা। এখন টিচাররা ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নিলে হয়।”

টুনি কিছু বলল না, কোনো একটা কিছু চিন্তা করতে লাগল। আম্মু একটু অবাক হয়ে তার মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার এইটুকুন মেয়ের ঘাড়ে কেমন করে এতো বড় বড় দায়িত্ব এসে পড়ে?

.

পরদিন টুনি একটু সকাল সকাল স্কুলে গিয়ে রাজুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। রাজু এসে তার সিটে স্কুলে ব্যাগটা রাখার আগেই টুনি তাকে ধরে ফেলল, গলা নামিয়ে বলল, “রাজু, বাইরে চল।”

“বাইরে? কেন?”

“খুবই জরুরি কাজ।”

“কী কাজ?”

“আয় আমার সাথে বলছি।“

রাজু একটু অবাক হয়ে স্কুল ব্যাগটা ডেস্কে রেখে টুনির সাথে বাইরে এল। টুনি বারান্দার এক কোণায় একটা নিরিবিলি কোণায় গিয়ে রাজুকে বলল, "তোকে একটা কাজ করে দিতে হবে।"

"কী কাজ?"

"খুবই জরুরি কাজ। তোকে করে দিতেই হবে। যেভাবে পারিস।"

রাজু একটু অধৈর্য্য হয়ে বলল, "কী কাজ সেটা আগে বলবি তো।"

টুনি বলল, "আমাদের ক্লাশে একটা নতুন মেয়ে এসেছে দেখেছিস তো?"

"হ্যাঁ, কারো সাথে কথা বলে না। টিফিন ছুটির সময় নিজের সিটে চুপচাপ বসে থাকে। "

"হ্যাঁ। আজকে টিফিন ছুটির পর সবাই যখন বের হয়ে যাবে তখন তুই ঐ মেয়েটাকে দুই মিনিটের জন্য বাইরে নিয়ে যাবি।"

রাজু চোখ কপালে তুলে বলল, "আমি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি কেমন করে ঐ মেয়েকে ক্লাশরুমের বাইরে নিব? ঐ মেয়ে কারো সাথে কথা পর্যন্ত বলে না।"

"আমি এতো কিছু বুঝি না। তুই যেভাবে পারিস ঐ মেয়েটাকে কিছু একটা বলে দুই মিনিটের জন্য বাইরে নিবি। কী বলবি তুই ঠিক কর।"

"কী আশ্চর্য–"

টুনি মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "এর মাঝে আশ্চর্যের কিছু নাই। শুধু শুনে রাখ এটা একটা জীবন মরণের ব্যাপার –"

"জীবন মরণ?"

"হ্যাঁ তোকে আমি সব বলব, এখন আমার কাজটা করে দে।"

রাজু কেমন জানি অবাক হয়ে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "আমি চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু এই মেয়ে আমার কথা শুনবে কেন?"

"চেষ্টা করে দেখ। যেভাবে পারিস।"

টিফিনের ছুটির ঘণ্টার পর টুনি আজকে অন্য সবার সাথে ক্লাশরুম থেকে বের হয়ে গেল। টুনির হাতে দুটো ছোট প্যাকেট। সে ক্লাশরুম থেকে বের হয়ে বেশি দূরে গেল না। দরজার কাছে নিজেকে একটু আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইল। রাজু যদি মেঘবতাঁকে ক্লাশরুম থেকে বের করে আনতে পারে তাহলে সে ভিতরে ঢুকে যাবে।

সবাই বের হয়ে যাবার কয়েক মিনিট পর রাজু একটু ব্যস্ত ভঙ্গীতে ক্লাশরুমে ঢুকল, গলা উঁচিয়ে মেয়েটিকে ডাকল, "মেঘবতী।"

মেঘবতী একটু অবাক হয়ে রাজুর দিকে তাকাল।

রাজু গলায় একটুখানি ব্যস্ততা ফুটিয়ে বলল, "তুমি এক সেকেন্ডের জন্য একটু বাইরে আসবে?"

মেঘবতী চোখ বড় বড় করে রাজুর দিকে তাকিয়ে রইল। টুনি সেদিন টিফিন ছুটিতে তাকে রাজুর কথা বলেছে, রোল নম্বর এক

এবং খুবই ভালো ছেলে তাই তাকে সে চিনে। কিন্তু সে একবারও ভাবেনি যে রাজু তাকে এভাবে ডাকবে।

রাজু দুই পা এগিয়ে এসে কাতর গলায় বলল, "প্লিজ তুমি এক সেকেন্ডের জন্য আস। শুধু একটা জিনিস দেখে আমাকে একটা কথা বলবে। তুমি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে এটা হবে না। প্লিজ!"

মেঘবতী একটু নড়ে বসে এই প্রথম একটা কথা বলল, "কী দেখব?"

"ক্লাশের সবাই মিলে আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে। আমাকে বলছে আমি নাকি কালার ব্লাইন্ড, রং ঠিক দেখি না– উল্টাপাল্টা দেখি। তুমি প্লিজ বাইরে এসে দুইটা ফুল দেখে বলবে কোনটা কী রং-প্লিজ!"

শেষ পর্যন্ত মেঘবতী উঠে দাঁড়াল এবং রাজুর সাথে হেঁটে বাইরে গেল। রাজু তাকে বারান্দার আরেক মাথায় নিয়ে ফুলের বাগানের দুইটা ফুল দেখিয়ে বলল, "বাম পাশের ফুলটার কী রং বলবে প্লিজ?"

টুনি তখন হুট করে ক্লাশের ভিতর ঢুকে গেল। মেঘবতীর স্কুলের ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে তার ওষুধের হলুদ রঙের ব্যাগটা বের করে তার হাতের খালি প্যাকেটে সবগুলো ওষুধ ঢেলে নিল। তারপর অন্য প্যাকেটের ওষুধগুলো হলুদ প্যাকেটে ঢেলে প্যাকেটটা তার স্কুলের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিল। গতকাল সে যে ভিটামিন সি-এর লজেন্সের মতো ট্যাবলেটগুলো কিনেছে সেগুলো সে কেটে আলাদা করে এনেছে। ব্যাগের উপরে হাত দিয়ে মেঘবতী কখনো বুঝতে পারবে না এগুলো তার ঘুমের ওষুধ না। সত্য কথা বলতে কী ভিতরে উঁকি দিয়েও বুঝতে পারবে না, শুধু বের করে উপরের নাম পড়লে বুঝতে পারবে।

টুনির কাজ শেষ। সে যখন চলে আসবে তখন হঠাৎ লক্ষ করল মেঘবতী যে বইটা খুলে ভিতরে তাকিয়ে থাকে সেই বইটা স্কুল ব্যাগের নিচে চাপা দিয়ে রাখা আছে। টুনি শুনল রাজু এখনো কথা বলছে, মেঘবতী এক্ষুণি চলে আসবে না–তাই সে বইটা বের করে এনে খুলল সাথে সাথে একটা ফটো বের হয়ে এল। একজন সুন্দরী মহিলা মেঘবতাঁকে ধরে রেখেছে। দুজনেই হাসছে, কী সুন্দর হাসি। মহিলার চেহারা ঠিক মেঘবতীর মতো। তার মানে নিশ্চয়ই তার মা। বইয়ের ভিতর ছবি রেখে ক্লাশের ফাঁকে ফাঁকে সেটার দিকে তাকিয়ে কাঁদে। তার মানে নিশ্চয়ই মেঘবতীর মা মারা গেছেন! টুনির বুকটা দুঃখে ভেঙে গেল। সে বইটা মেঘবতীর স্কুল ব্যাগের নিচে আগের মতো রেখে দিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসে গেল। ব্যাগের ভিতর প্যাকেট দুটো রেখে সে তার ডাইরিটা বের করে সেখানে খুব মনোযোগ দিয়ে লিখতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘবতী এবং তার পিছু পিছু রাজু ক্লাশে এসে ঢুকল। রাজু টুনিকে দেখে একটু অবাক হওয়ার ভান করে বলল, “তুই এখানে?”

“হ্যাঁ। কেন কী হয়েছে?”

“তোদের সব দুই নম্বুরি কাজ আমি বের করে ফেলেছি।”

টুনি হাসি হাসি মুখে বলল, “কোন দুই নম্বুরি কাজ তুই বের করে ফেলেছিস?”

“ঐ যে সবাই মিলে আমাকে বোঝালি ডালিয়া ফুলটার রং নীল! আমি কালার ব্লাইন্ড তাই সেটাকে হলুদ দেখি।”

“আসলেই তো তাই।”

“মেঘবতাঁকে বাইরে নিয়ে দেখিয়েছি। মেঘবতী বলেছে এটা আসলেই হলুদ। তোরা সবাই মিলে আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছিস!”

টুনি বলল, “তুই কী একটা জিনিস চিন্তা করে দেখেছিস?”

“কী জিনিস?”

“হয়তো মেঘবতীও তোর মতো কালার ব্লাইড! সেও নীল ফুলটাকে হলুদ দেখছে!”

রাজু হতাশার মতো ভঙ্গী করে মাথা নেড়ে বলল, “তুই বললেই আমি বিশ্বাস করব? তুই জানিস না মেয়েরা বলতে গেলে কালার ব্লাইন্ড হয়ই না–এটা ছেলেদের সমস্যা!

টুনি বলল, “না জানলেও আন্দাজ করতে পারি। সব সময় সব সমস্যা হয় ছেলেদের! আমরা মেয়েরা যে কীভাবে তোদের সহ্য করি সেটাই আমি মাঝে মাঝে ভাবি।

রাজু হতাশার ভঙ্গী করে মাথা নাড়তে নাড়তে ক্লাশরুম থেকে বের হতে লাগল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেঘবতীর দিকে তাকিয়ে বলল, “থ্যাংকু মেঘবতী।”

মেঘবতী কোনো কথা বলল না। টুনি দেখল সে তার স্কুল ব্যাগের ভিতর হাত ঢুকিয়েছে। নিশ্চয়ই দেখছে তার ওষুধের প্যাকেটটা আছে কিনা । মেঘবতী হাতটা বের করে আনে। কোনো কিছু সন্দেহ করেনি।

টুনি ডাইরি লেখার ভান করে পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে। সে যেহেতু ঘুমের ওষুধগুলো সরিয়ে নিয়েছে তাই হাতে একটু সময়

পেয়েছে। আজকেই তাদের হেড মিস্ট্রেসকে না বললেও ক্ষতি নেই। যদি তাদের টিচার গার্জিয়ানদের সাথে এটা নিয়ে কথা বলা হয় তাহলে সব মিলিয়ে বিশাল হৈচৈ শুরু হবে। বড় মানুষেরা কোনো কিছু শান্তভাবে করতে পারে না। বড়দের না জানিয়ে সে কী কোনোভাবে অন্যদের নিয়ে কাজটা শেষ করতে পারে না? তাদের ক্লাশের সালমারও মা মারা গেছেন সে তো বেশ সামলে নিয়েছে। ক্লাশ টেনের শাপলা আপুরও তো মা মারা গেছে, তাকে দেখে কেউ সেটা বিশ্বাস করবে? তাহলে সবাই মিলে যদি মেঘবতাঁকে সাহায্য করে তাহলে বড়দের কিছু না জানিয়ে কী কাজটা করা যায় না? বেশি কিছু তো না, শুধু মেঘবতাঁকে দিয়ে তাদের সাথে কথা বলাতে হবে।

টুনি আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে থাকে।

.

বাসায় আসামাত্র টুনিকে তার আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, "তোদের টিচারকে জানিয়েছিস?"

"না আম্মু। এখনো বলিনি।"

"সর্বনাশ! দেরি করছিস কেন? যদি ঘুমের ওষুধগুলো খেয়ে ফেলে?"

টুনি মাথা নাড়ল, বলল, "না আম্মু, খাবে না।

"তুই কেমন করে জানিস খাবে না?"

টুনি তার ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে একটা প্যাকেট বের করে আম্মুকে দেখিয়ে বলল, "এই যে! ওষুধগুলো এখন আমার কাছে! আমি তার

প্যাকেটে ভিটামিন সি ট্যাবলেট দিয়ে এসেছি। খেয়ে ফেললেও ক্ষতি নেই।”

আম্মু চোখ কপালে তুলে ফেললেন, কীভাবে কাজটি করেছে জিজ্ঞেস করলেন। তার মেয়ের কাজ কর্ম আম্মু নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারেন না। হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গী করে মাথা নেড়ে বললেন, “কিন্তু দেরি করিস না। ঘুমের ওষুধ ছাড়াও সুইসাইড করা যায়।”

পরের দিন টিফিনের ঘণ্টা পড়ার পর যখন সবাই ক্লাশরুম থেকে বের হয়ে গেল তখন টুনি নিজের সিট থেকে উঠে মেঘবতীর কাছে গেল । মেঘবতীর পাশে দাঁড়িয়ে খুবই শান্ত গলায় বলল, “মেঘবতী, তোমার সাথে আমি একটু কথা বলতে চাই।”

মেঘবতী একটু অবাক হয়ে টুনির দিকে তাকালো, তারপর প্রায় শোনা যায় না সেভাবে বলল, “কী কথা?”

টুনি বলল, “আমি এখানে বলতে পারব না। যে কোনো সময় কেউ চলে আসতে পারে। আমার সাথে চল, বাইরে একটু নিরিবিলি জায়গায় কথা বলি।”

মেঘবতী মাথা নাড়ল, সে কোনো কথা বলতে চায় না। তারপর, মুখ ঘুরিয়ে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইল। এরকম একটা কিছু হবে টুনি জানতো। সে বেশি অবাক হলো না। আগের চেয়েও শান্ত গলায় বলল, “দেখো মেঘবতী আমি জানি তোমার খুব মন খারাপ। তুমি কোনোভাবে তোমার আম্মুর কথা ভুলতে পারছ না —

মেঘবতী ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠল, কাঁপা গলায় বলল, “তুমি কেমন করে জান?”

টুনি বলল, “আমি আরো অনেক কিছু জানি। আমি জানি তুমি সুইসাইড করার কথা চিন্তা করছ।”

মেঘবতী এবারে ঝট করে ঘুরে টুনির দিকে তাকালো। কিছু একটা বলার চেষ্টা করল কিন্তু বলতে পারল না। টুনি বলল, “আমি এটাও জানি যে তুমি ফার্মেসি ঘুরে ঘুরে ঘুমের ওষুধ কিনছ।“

মেঘবতাঁকে এখন কেমন জানি হিংস্র দেখায়, তার চোখ দুটি জ্বলে ওঠে, হিসহিস করে বলল, “তুমি কেমন করে এতো কিছু জান? কেমন করে?”

“সেটা নিয়ে পরে কথা বলা যাবে। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ তুমি যে সুইসাইড করার কথা ভাবছ সেই কথাটা আমাদের টিচারদের বলতে হবে। আমাদের যে হেড মিস্ট্রেস আছেন সেই ম্যাডাম আমাকে অনেক আদর করেন। আমি গিয়ে যদি বলি তাহলে ম্যাডাম সাথে সাথে ব্যবস্থা নিবেন। অফিসে নিশ্চয়ই তোমাদের বাসার টেলিফোন নম্বর আছে, সেখানে ফোন করবেন। দরকার হলে নিজেই চলে যাবেন। বুঝতে পারছ?”

মেঘবতাঁকে কেমন যেন আতংকিত দেখা গেল, সে বলল, “না! না!”

টুনি বলল, “আমিও বলতে চাই না মেঘবতী। বড় মানুষদের কাজকর্ম ঠিক নেই। তারা ছোটদের ব্যাপার স্যাপার বুঝে না। তারা মনে করে যে আমরা কিছু বুঝি না তারাই সব কিছু বুঝে। তারা তোমার বিষয়টা জানলে এমন হাউকাউ শুরু করে দেবে, এমন ঘোঁট পাকাবে তুমি চিন্তাও করতে পারবে না। এখন তুমি বল, তুমি কি সেটা চাও?”

মেঘবতী মাথা নেড়ে জানাল, সে এটা চায় না।

“আমিও চাই না। কিন্তু এটা তো অনেক সিরিয়াস। কাজেই তুমি আমার কথা শোনো। প্লিজ! তুমি আমার সাথে আস।” টুনি মেঘবতীর হাত ধরে বলল, “প্লিজ! প্লিজ! প্লিজ!”

টুনি ভেবেছিল মেঘবর্তী ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে দিবে কিন্তু হাত সরালো না। একটু পর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “চল।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই টুনি মেঘবতাঁকে নিয়ে স্কুল বিল্ডিংয়ের শেষ মাথায় চলে এলো। জায়গাটা নির্জন, কয়েকটা বড় বড় গাছ দিয়ে ঢাকা পড়ে আছে। সেখানে টুনিদের ক্লাশ টেনের শাপলা আপু আর তাদের ক্লাশের সালমা বসে আছে। টুনি এই দুইজনকে আগে থেকে খবর দিয়ে রেখেছিল। দুজনেরই মা মারা গেছেন।

টুনি মেঘবতাঁকে নিয়ে সেখানে হাজির হয়ে বলল, “শাপলা আপু এই হচ্ছে মেঘবতী। সুষমা মেঘবতী।”

শাপলা আপু কোনো ভূমিকার ধারে কাছে গেল না, একেবারে সরাসরি জিজ্ঞেস করে বসল, “তোর মা মারা গেছে সেজন্য তুই সুইসাইড করার কথা চিন্তা করছিস? আমি কিন্তু পোলাপানদের তুমি তুমি করে বলতে পারব না, আগেই বলে রাখছি।

মেঘবতী একেবারে সরাসরি এরকম প্রশ্ন শুনে থতমত খেয়ে গেল। কেমন যেন অবাক হয়ে শাপলা আপুর দিকে তাকিয়ে রইল। সালমা বিষয়টাকে সহজ করার জন্য কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু শাপলা সুযোগ দিল না, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গেল, আঙুল দিয়ে মেঘবতীর বুকে টোকা দিয়ে বলল, “শোন, তোকে আমি বলি। আমার মা যখন মারা গেছে তখন আমি ক্লাশ নাইনে পড়ি। আমার কাছে মনে হলো পুরো দুনিয়াটা অন্ধকার হয়ে গেল, বুঝলি? কুচকুচে কালো–কী কষ্ট, কী কষ্ট–বাচ্চা কালে যাদের মা মারা যায় নাই তারা ছাড়া আর কেউ সেটা চিন্তাও

করতে পারবে না। যখন আমার মনে হলো আমি আর সহ্য করতে পারব না তখন আমি ঠিক তোর মতো ঠিক করলাম সুইসাইড করব। সন্ধেবেলা যখন কেউ লক্ষ করছে না আমি বাসার ছাদে গিয়ে রেলিংয়ের উপরে দাঁড়ালাম, ছয় তালার ছাদ, নিচে তাকাতে ভয় লাগে তাই উল্টা হয়ে দাঁড়ালাম এইভাবে—"

শাপলা তখন দুই হাত দুইদিকে ছড়িয়ে দিয়ে দেখালো সে কীভাবে দাঁড়িয়েছিল। তারপর আবার বলতে শুরু করল, "আমি তখন দুই চোখ বন্ধ করে উপর দিকে তাকিয়েছি তখন কী হলো জানিস?"

মেঘবতী চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল, "কী হলো?"

"আমি স্পষ্ট দেখলাম আমার মা'কে। আমার মা প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বলল, খবরদার! খবরদার তুই যদি ছাদ থেকে লাফ দিস। আমি কী তোকে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে মরার জন্য জন্ম দিয়েছিলাম? নেমে আয় রেলিং থেকে–নেমে আয় বলছি—"

টুনি অবাক হয়ে শাপলার দিকে তাকিয়ে রইল, শাপলা আপু খুবই শক্ত মেয়ে কিন্তু হঠাৎ তার গলাটা কেমন জানি ধরে এল। গলাটা একটু পরিষ্কার করে বলল, "আমার মা বলল, তোদের আমি আদর করে বড় করতে পারি নাই। আগেই চলে যেতে হয়েছে। আমি যেটা পারি নাই তোদেরকে সেটা করতে হবে। তোকে বড় হতে হবে, তারপর তোকে বিয়ে করতে হবে, তোর ঘর ভরা ছেলেপুলে হবে তুই তাদের আদর দিয়ে বড় করবি।"

শাপলা আপু থামল, তারপর বলল, "এরপর মা আমাকে সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট কথাটা বলল।"

মেঘবতী জিজ্ঞেস করল, "সেইটা কী?"

“মা বলল, বোকা মেয়ে! তুই ভেবেছিস আমি নাই? আমি আছি। আমি সবসময় তোর সাথে আছি। সবসময় তোর সাথে আছি।”

শাপলা ঘুরে মেঘবতীর দিকে তাকাল, বলল, “তুই টের পাস না যে তোর মা তোর সাথে আছে? সবসময় তোর সাথে আছে?”

মেঘবতী একটু ইতস্তত করে বলল, “না মানে –”

“আছে, আছে। তোর মা সব সময় তোর সাথে থাকে। এই এখন যে আমরা কথা বলছি, আমাদের মায়েরা উপর থেকে আমাদের কথা শুনছে।’ শাপলা আপু উপর দিকে তাকাল, বলল, “উপরে তাকিয়ে দেখ, চোখ খুলে দেখলে হবে না, চোখ বন্ধ করে দেখতে হবে তাহলে তোর মা’কে দেখতে পাবি! মায়েরা সব সময় তাদের ছেলেমেয়েদের সাথে থাকে।” শাপলা আপু সালমার দিকে তাকালো, “তাই নারে সালমা? তোর মা তোর সাথে থাকে না?”

সালমা মাথা নাড়ল, “সব সময় থাকে। আমার আম্মু আমার সাথে না থাকলে আমি কী টিকে থাকতে পারতাম?”

শাপলা আপু বলল, “এই সালমারে দেখ। আমাদের মাঝে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা সালমার। তার মা মরে গেল, সেই দুঃখে বাবার মাথাটাও আউলা ঝাউলা হয়ে গেল। সালমাকে তার বাবারে দেখতে হয়, ছোট ভাইবোনদের দেখতে হয়। মাঝে মাঝে সারারাত জেগে থাকতে হয়। ক্লাশে এসে মুখ হা করে ঘুমায়—”

সালমা আপত্তি করল, “আমি মোটেও মুখ হা করে ঘুমাই না।”

শাপলা আপু ধমক দিয়ে বলল, “তুই কেমন করে বলবি তুই মুখ হা করে ঘুমাস নাকি মুখ বন্ধ করে ঘুমাস? বসে বসে ঘুমালে সব সময় মানুষের মুখ হা হয়ে যায়!”

সালমা আবার আপত্তি করল, "না শাপলা আপু –"

শাপলা আপু বলল, "ঠিক আছে। এইটা ইম্পরট্যান্ট না। ইম্পরট্যান্ট হচ্ছে জানা যে তোর আম্মু সব সময় তোর সাথে আছে।" শাপলা আপু এবারে মেঘবতীর দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে মেঘবতী এখন তুই বল সুইসাইড করার দরকার আছে?"

মেঘবতী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর নিচের দিকে তাকিয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখের কোণাটা মুছে ফেলে মাথা নাড়ল। ফিসফিস করল, "নাই।

সালমা বলল, "বুঝলে মেঘবতী আমি আর শাপলা আপু দুই জনেই এর ভিতর দিয়েছি, কী কষ্ট কী কষ্ট! মনে হয় এই কষ্টেই মরে যাব। কিন্তু দেখবে তুমি মরবে না। কষ্টটা কীভাবে কমাতে হয় জান?"

"কীভাবে?"

"কারো সাথে এই কষ্টটার কথা বলতে হয়। আমরা সেই জন্য এসেছি। তুমি আমাদের বলবে। সবকিছু বলবে। কষ্টটা খুবই আজব। আরেকজনের কাছে বলা খুবই কঠিন, কিন্তু যদি বলতে পার, তাহলে দেখবে কষ্টটা কমে যাবে। মনে হয় ভাগাভাগি হয়ে যায়।"

শাপলা মাথা নাড়ল, বলল, "সালমা ঠিকই বলেছে, কষ্ট ভাগাভাগি হলে কমে। আনন্দ ভাগাভাগি হলে বাড়ে। বুঝেছিস?"

মেঘবতী মাথা নাড়ল। শাপলা আপু বলল, "তাহলে তুই কী আমাদেরকে বলবি?"

মেঘবতী নিচু গলায় বলল, “কী বলব?”

“তোর মায়ের কথা। তোর দুঃখের কথা। কষ্টের কথা।”

“কিন্তু আমি তো কখনো আমার কষ্টের কথা কাউকে বলি না।“

সালমা বলল, “আমরা জানি, কষ্টের কথা অন্যকে বলা খুব কষ্টের! কিন্তু আমরা তো ঠিক তোমার মতো কষ্টের ভিতর দিয়ে গিয়েছি। আমরা এখানে এসেছি খালি তোমার সাথে কথা বলার জন্য। বলবে?”

মেঘবতী শেষ পর্যন্ত মাথা নেড়ে বলল, “চেষ্টা করব।”

শাপলা আপুর মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল, “গুড গার্ল! নে বস। বলতে বলতে যদি চোখে পানি চলে আসে কেঁদে ফেলিস। লজ্জা করিস না। এই দেখ আমি টিস্যুর প্যাকেট নিয়ে এসেছি চোখ মোছার জন্য।”

সালমা বলল, “দেও আপু, আমাকে কয়টা টিস্যু দাও। আমার খুব অল্পতে চোখের পানি চলে আসে।”

মেঘবতী বসল। তার দুই পাশে দুইজন–শাপলা আপু আর সালমা। টুনি বসল তাদের পায়ের কাছে। শাপলা আপু শুরু করিয়ে দিল, বলল, “প্রথমে বল তোর আম্মু দেখতে কেমন ছিল-“

মেঘবতী বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “আমার মা ছিল অপূর্ব সুন্দরী, একেবারে পরির মতন…।”

.

যখন টিফিন ছুটি শেষের ঘণ্টা পড়ল তখন মেঘবতী থামল। একটা টিস্যু দিয়ে নিজের নাক মুছল। শাপলা আপু আর সালমা তারাও তাদের চোখ মুছল। শাপলা আপু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্তই। বাকিটা কালকে।

মেঘবতী বলল, "কালকেও?"

"হ্যাঁ। যতদিন তুই স্বাভাবিক না হচ্ছিস ততদিন।"

সালমা বলল, "তুমি কী এখনও সুইসাইডের কথা চিন্তা করছ?" মেঘবতী মাথা নাড়ল, বলল, "না।"

"তাহলে তোর ঘুমের ট্যাবলেটগুলো এখনই টয়লেটে ফেলে দিয়ে ফ্লাশ করে দে।"

টুনি অনেকক্ষণ পর এই প্রথম কথা বলল, "তার দরকার হবে না শাপলা আপু। মেঘবতী ইচ্ছা করলে খেতে পারে।"

শাপলা চোখ কপালে তুলে বলল, "খেতে পারে?"

"হ্যাঁ। আমি ঘুমের ট্যাবলেটগুলো আগেই সরিয়ে ফেলেছি। তার জায়গায় আছে ভিটামিন সি-এর ট্যাবলেট। খেতে খুব মজা– লজেন্সের মতো।"

শাপলা আপু টুনির ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তুই এতে বড় মিচকি শয়তান? এতো বড় ধুরন্ধর? এতে বড় মতলববাজ?"

টুনি নিজেকে শাপলা আপুর থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে করতে বলল, "মিচকি শয়তানের কী আছে? যেখানে জীবন-মরণ নিয়ে কথা সেইখানে রিস্ক নেওয়া ঠিক না।"

মেঘবতী অবাক হয়ে টুনির দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল। তারপর প্রথমবার ফিক করে হেসে বলল।

টুনি অবাক হয়ে দেখল মেয়েটা যখন হাসে তখন তাকে কী সুন্দরই না দেখায়।

.

এক সপ্তাহ পর মেঘবতাঁকে সবার সাথে সাতচাড়া খেলতে দেখা গেল। কী তার নিশানা! প্রত্যেকবার প্রথমবারই টেনিস বল ছুঁড়ে চাড়া ভেঙে ফেলে।

কার ভিতরে কী প্রতিভা আছে বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল!